গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৩ বর্ষ ২০ সংখ্যা ২৪ - ৩০ ডিসেম্বর, ২০১০ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

পেট্রোলের দাম বাড়ানোর তীব্র প্রতিবাদ জানাল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

চড়া হারে পেট্রোলের দাম বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পেট্রোলিয়াম কোম্পানিগুলির সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের যোগসাজশের তীব্র নিন্দা করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৫ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

কংগ্রেস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রোলিয়ামের দাম নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে বৃহৎ পেট্রো কোম্পানিগুলির মালিকদের যখন যেভাবে খুশি জনসাধারণের অর্থ লুট করার লাইসেন্স দিয়ে দিয়েছে। নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়ার পর থেকে ইতিমধ্যেই ৫ বার পেট্রোপণ্যের দাম বাড়াবার পরও আবার তারা এক ধাক্কায় পেট্রোলের দাম ২ টাকা ৯৫ পয়সা বাড়িয়ে দিয়েছে, রাজ্যের ও কেন্দ্রের করগুলি যুক্ত হলে যা ৩ টাকারও বেশি হয়ে দাঁড়াবে। এর অনিবার্য পরিণতিতে মুদ্রাস্ফীতির চাপ বাড়বে এবং সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম আরও বৃদ্ধি পাবে। পেট্রোলের এই মূল্যবৃদ্ধি, ইতিমধ্যেই ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির চাপে ন্যুব্জ জনসাধারণের পিঠ দেওয়ালে ঠেকিয়ে দেবে।

তেল কোম্পানিগুলির মুনাফার পরিমাণ এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, এগুলির মালিকরা বিশ্বের প্রথম ২০ জন শত শত কোটি টাকার মালিকদের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। এই ঘটনা উল্লেখ করে কমরেড ঘোষ তীব্র ধিক্কার জানিয়ে বলেন, পূর্বতন বিজেপি পরিচালিত এন ডি এ সরকার এবং সিপিএম সমর্থিত ইউ পি এ সরকারের মতোই কংগ্রেস পরিচালিত বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারও এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্পূর্ণ গোপন করে পেট্রো কোম্পানির মালিকদের জন্য অশ্রু বর্ষণ করছে এবং তার দ্বারা তেলমালিকদের লোকসানের মিথ্যা কাহিনীকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করছে।

পেট্রোলিয়ামের এই চড়া দাম বৃদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ করে কমরেড প্রভাস ঘোষ এর বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য দুর্দশাগ্রস্ত সাধারণ মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

বিক্ষোভের ছবি ঃ আটের পাতায়

দুর্নীতির উৎসমূলে আঘাত করতে হবে

দেশ জুড়ে দুর্নীতির কাদা যেভাবে ঘুলিয়ে উঠেছে, তাতে সংসদীয় রাজনীতিতে, সরকার ও প্রশাসনে সুনীতি বা নৈতিকতা বলে আর যে কিছু অবশিষ্ট নেই, তা পরিষ্কার। এ বারের দুর্নীতি ফাঁসের ঘটনায় মন্ত্রী ও কর্পোরেট পুঁজিপতিরাই শুধু নয়, জড়িয়ে আছে সংবাদ মাধ্যমের একটি অংশও। সংসদীয় গণতন্ত্রের ঢক্কানিনাদের আড়ালে কীভাবে দেশের পুঁজিপতি শ্রেণী নানা চ্যানেলে মন্ত্রীদের থেকে শুরু করে আমলা ও এমনকী সংবাদমাধ্যমকেও নিজেদের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করে এবং চালায় তাও এবারের ঘটনায় বেআব্রু হয়ে গেছে। পরপর নানা দুর্নীতির ঘটনায়, যাকে সরকারি সম্পত্তির লুঠ বলাই শ্রেয়, অনেকে ভাবছেন মানব সমাজে দুর্নীতি যেন চিরকালই ছিল এবং থাকবে, এর হাত থেকে মুক্তি নেই। কিন্তু ইতিহাস তা বলে না। লোভ-লালসা, ব্যক্তিগত হীন স্বার্থবোধ, যেকোনও উপায়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বানাবার ও বাড়াবার মনোভাব. মুনাফা বৃদ্ধির তাগিদে অপর পক্ষকে যে কোনও উপায়ে কোণঠাসা করে এগিয়ে যাওয়ার মনোবৃত্তি, যা আজ গোটা সমাজকে কুরে কুরে খাচ্ছে, সেগুলো মানুষের চরিত্রে চিরকাল ছিল না; সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হওয়ার পর, অসাম্য ও বৈষম্য কায়েম হওয়ার পরই এসেছে। সমাজে যখন শ্রেণী বিভাজন ঘটেনি, অপরের শ্রম চুরি করে মুষ্টিমেয়র বিত্তশালী হওয়া ও অধিকাংশের সুযোগ-সুবিধাহীন বঞ্চিত-শোষিতে পরিণত হওয়া ঘটেনি, তখন এ সবের অস্তিত্বই মানুষ জানত না। প্রতিটি শ্রেণীবিভক্ত শোষণমূলক সমাজেই শাসনব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা কোনও না কোনও ভাবে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়েছে এবং গোটা সমাজ জুড়েও দুর্নীতির বিষ ছড়িয়ে পড়েছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়, বিশেষ করে যখন পুঁজিবাদ মুমূর্ষু, জরাগ্রস্ত, যখন জাতীয়তাবাদী আদর্শ ঐতিহাসিকভাবেই তার ভূমিকা হারিয়েছে, যখন কোনও রকম মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ধার ধারে না পুঁজিবাদ, তখন যাবতীয় রকমের দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ এক চরম স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে। শুধু ভারতবর্ষ নয়, বিশ্বের কি শিল্পোন্নত, কি পিছিয়ে পড়া সকল পুঁজিবাদী দেশেই চোখে পড়বে চুরি-দুর্নীতি-স্বজপোষণের দগদগে ঘা। রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে নানা মন্ত্রী-আমলা-পুলিশ-প্রশাসন-মিলিটারি-বিচারবিভাগ সবই আজ প্রায় প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশে দুর্নীতির পাঁকে ডুবে আছে। বোঝাই যায়, দুর্নীতির ব্যাধি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাথেই ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। এই সুনির্দিষ্ট পটভূমিতেই পুঁজিবাদী ভারতে সাম্প্রতিক ব্যাপক দুর্নীতিমূলক ঘটনাবলীকে দেখা দরকার।

কেন্দ্রীয় সরকারের টেলিকম বিভাগের দ্বারা টেলিফোনের সেকেন্ড জেনারেশন প্রযুক্তির (টু-জি) লাইসেন্স বিলি নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই অভিযোগ উঠেছিল যে, এই লাইসেন্স নামমাত্র মূল্যে বিশেষ কিছু কোম্পানিকে পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। যার বিনিময়ে বিপুল পরিমাণ ঘুষের টাকা লেনদেন হয়ে গেছে। পূর্বতন টেলিকম মন্ত্রী রাজার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল, তিনি বেছে বেছে বেআইনিভাবে

ছয়ের পাতায় দেখুন

২০ ডিসেম্বর ডি এস ও-র ধিক্কার দিবস পালন

হাওড়ার আন্দুলে প্রভু জগবন্ধু কলেজের ছাত্র স্বপন কোলের মর্মান্তিক মৃত্যু দুঃখজনক। দীর্ঘ ৩৪ বছর ধরে রাজ্যের কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে এস এফ আই-এর সন্ত্রাসের রাজনীতিরই এ এক মর্মান্তিক পরিণাম। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের অপকর্মকে আড়াল করার জন্য এস এফ আই স্বপন কোলের মৃত্যুকে হাতিয়ার করে ২০

দুয়ের পাতায় দেখুন

পুরুলিয়ায় যৌথবাহিনীর হাতে লাঞ্ছিত খরাক্লিষ্ট মানুষের মিছিল

দাবি মানা দূরের কথা, আন্দোলনকারীদের উপর নির্মম আক্রমণ চালাল পুলিশ

মাওবাদী দমনের নামে নিরীহ গ্রামবাসীদের ওপর যৌথবাহিনীর অকথ্য নির্যাতন, এস ইউ সি আই (সি)-র নেতা-কর্মী-সংগঠক-সমর্থকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মাওবাদী অভিযোগ এনে গ্রেফতার ও নজরদারির নামে হয়রানির প্রতিবাদে এবং মাওবাদী অভিযোগে ধৃত দলের কর্মী-সমর্থক সহ অন্যান্যদের নিঃশর্ত মুক্তি, খরা মোকাবিলার প্রতিশ্রুতি কার্যকর করা, মূল্যবৃদ্ধি রোধ ইত্যাদি দাবিতে ১৩ ডিসেম্বর এস ইউ সি আই (সি)-র নেতৃত্বে পুরুলিয়া জেলাশাসকের দপ্তরে গণঅভিযান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ঐ দাবিগুলিতে স্মারকলিপি পেশ করার সিদ্ধান্তের কথাও জেলাশাসককে আগাম জানিয়ে দেওয়া হয়। এই কর্মসূচিতে সাড়া দিয়ে জেলার ২০টি ব্লকের সবকটি থেকেই কয়েক হাজার মানুষ সমবেত হয়েছিলেন। এসেছিলেন পুরুলিয়ার জঙ্গলমহলে যৌথবাহিনীর হাতে লাঞ্ছিতরা, এসেছিলেন খরাক্লিষ্ট নিরন্ন মানুষ, ছাত্র, যুবক, মহিলা, সন্তান কোলে মায়েরা। তাঁরা মিছিল করে এগিয়ে চললেন। মিছিল ছিল নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ, কিন্তু দৃঢ় সংগ্রামী চেতনায় উদ্দীপ্ত। মিছিল যত এগিয়েছে রাস্তার দু-পাশে তত ভিড় জমেছে।

শহর পরিক্রমা শেষে মিছিল এসে থামল জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে। সমবেত জনতার দাবি, জেলাশাসকের কাছে নিজমুখে তাদের বক্তব্য জানাবেন। কিন্তু আপাদমস্তক জনবিরোধী চরিত্রের অধিকারী সিপিএম সরকার এবং প্রশাসনের পক্ষে আজ আর এই দাবি মানা সম্ভব নয়। তাই সাক্ষাৎ করা তো দূরের কথা, বিনা প্ররোচনায় শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের ওপর নির্মমভাবে চলল লাঠিচার্জ। আচমকা এই আক্রমণে কয়েকজন প্রবীণ মহিলা পড়ে গিয়ে আহত হলেন। একটি শিশু

সাতের পাতায় দেখুন

মুর্শিদাবাদে মোটরভ্যান চালকদের বিক্ষোভ

মোটরভ্যান চালকদের উপর পুলিশি জুলুম বন্ধ, আটক মোটরভ্যান অবিলম্বে ফেরত, চালকদের পরিবহন শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা এবং লাইসেন্স প্রদান সহ সাত দফা দাবিতে সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়ন, মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার উদ্যোগে ১৩ ডিসেম্বর জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

পাঁচ শতাধিক ভ্যানচালকের একটি সুসজ্জিত মিছিল শহর পরিক্রমা করে জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায়। জেলাশাসক নির্দিষ্ট সময়ে দপ্তরে না থাকায় জানানো হয়, স্মারকলিপি গ্রহণ করা হবে না। এই বার্তা আন্দোলনকারীদের কাছে পৌঁছলে তাঁরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং রাস্তা অবরোধ করেন। তখন প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এডিএম স্মারকলিপি গ্রহণ করবেন।

সংগঠনের ৭ জন প্রতিনিধি স্মারকলিপি প্রদান করেন। বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস ও জেলা শাখার পক্ষে খোদাবক্স মণ্ডল। এ আই ইউ টি ইউ সি-র পক্ষে জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সামসুল আলম চালকদের উপর প্রশাসনিক অত্যাচার বন্ধ করার দাবি সহ তাঁদের ন্যায্য অধিকারের পক্ষে বক্তব্য রাখেন।

যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের গণঅবস্থান

যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের নেতৃত্বে ৭ ডিসেম্বর কলকাতায় রানি রাসমণি অ্যাভেনিউতে সরকারি-আধা সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের গণঅবস্থানের কর্মসূচি পালিত হয়। সারাদিনব্যাপী এই অবস্থানে প্রায় এক হাজার মানুষ সামিল হন।

আন্দোলনের মূল দাবিগুলি হল, তিন লক্ষাধিক শূন্যপদে নিয়োগ, ওয়াটার ক্যারিয়ার, সুইপার, সিএইচজি, টিডিসহ সমস্ত অনিয়মিত কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ, মহার্ঘভাতার স্থায়ী আদেশনামা প্রকাশ ও বকেয়া প্রদান, আধা সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষকদের ৮-১৬-২৫ বছরের সিএ স্কিমের সুযোগ, মূল্যবৃদ্ধি রদের ব্যবস্থা গ্রহণ, কর্মরত অবস্থায় মৃত/অক্ষম কর্মচারী ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের পোষ্যের নিঃশর্ত চাকরি ইত্যাদি।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন আহ্বায়ক ফটিক দে, বিপিটিএ নেতা কার্তিক সাহা, জেপিএ নেতা বিমল জানা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের বিশিষ্ট নেতা সাধন রায়, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্সদের বিশিষ্ট নেতা সুব্রত বণিক, ড্রাইভার্স অ্যান্ড মেকানিক্যাল এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের নেতা সেখ নাজিম, এসটিইএ নেতা বিশ্বজিৎ মিত্র, কনফেডারেশন (আইএনটিইউসি)-র সাধারণ সম্পাদক সুব্রত ভট্টাচার্য প্রমুখ। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ১৬ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি পূর্বেই পেশ করা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার সময় না দেওয়ায় আন্দোলনকারীরা চরম ক্ষুব্ধ হন এবং ভবিষ্যতে আরও দৃঢ় আন্দোলনের শপথ গ্রহণ করেন।

এ আই ডি এস ও-র ধিক্কার দিবস

একের পাতার পর

ডিসেম্বর যে যে ছাত্র ধর্মঘট ডেকেছে, সেই প্রসঙ্গে এ আই ডি এস ও-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড কমল সাঁই এক বিবৃতিতে বলেন, আমরা ২০ ডিসেম্বর ধিক্কার দিবস পালন করব। এই ধিক্কার শাসক দল সি পি এমের ছাত্র সংগঠন এস এফ আই-এর দখলদারি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। '৭০-এর দশকের ছাত্র পরিষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে গত ৩৪ বছর ধরে পুলিশ-প্রশাসনের সহায়তায় এস এফ আই কলেজে কলেজে একচেটিয়া দখলদারি ও সন্ত্রাস কায়েম করেছে। এ আই ডি এস ও-র নানা আন্দোলন গায়ের জোরে ভেঙেছে। এস এফ আই-এর আক্রমণে শিলিগুড়ি হিন্দি হাইস্কুলের ছাত্র সনু প্যাটেলের মৃত্যুর ঘটনা সকলেরই জানা। এমন কোনও কলেজ পাওয়া যাবে না যেখানে এস এফ আই-এর সন্ত্রাসে প্রতিবাদী ছাত্রদের রক্ত ঝরেনি। সম্প্রতি রাজ্যে সিপিএমের অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের যে ঝড় উঠেছে, ছাত্রসমাজও তার অংশীদার। তারাও এস এফ আই-এর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। বহু কলেজে যেখানে বছরের পর বছর এস এফ আই নির্বাচনই করতে দেয়নি, এখন সেখানে ছাত্ররা নির্বাচনের দাবি জানাচ্ছে, এস এফ আই-এর বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে মনোনয়ন পেশ করছে। এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে এস এফ আই অধিক সন্ত্রাসের রাস্তায় হাঁটছে এবং তার ফলেই সংঘর্ষ হচ্ছে, রক্ত ঝরছে।

আমরা মনে করি, উন্নত সংস্কৃতি ও নৈতিকতার আধারে যথার্থ গণতান্ত্রিক ছাত্র আন্দোলনই এস এফ আইয়ের সন্ত্রাসের রাজনীতির কবর রচনা করতে পারে। শিক্ষার ও ছাত্রদের বিভিন্ন ন্যায্য দাবি নিয়ে তেমন আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যই আমরা পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রসমাজের কাছে আবেদন জানাচ্ছি এবং সংঘবদ্ধভাবে সন্ত্রাসের রাজনীতির বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাতে আহ্বান করছি।

পথসভা, মিছিল প্রভৃতির মধ্য দিয়ে রাজ্য জুড়ে এ আই ডি এস ও-র ধিক্কার দিবস পালন। ছবিতে কলেজ স্ট্রিটের সভা

যৌথবাহিনী প্রত্যাহার, সিপিএম দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার, ঘরছাড়াদের ফেরানো সহ অন্যান্য দাবিতে ১৪ ডিসেম্বর পশ্চিম মেদিনীপুরের কোতোয়ালি থানায় এস ইউ সি আই (সি)-র বিক্ষোভ

আবাসন মন্ত্রীর আট দফা প্রতারণা

শুধু লাঠির জোরে জমি দখলই নয়, রাজারহাটে গরিব চাষি, খেতমজুর, মৎস্যজীবীসহ বসবাসকারী সাধারণ মানুষকে সিপিএম বঞ্চিত করছে বহুদিন থেকেই। এক যুগ আগে জমি অধিগ্রহণ করে পরম নিশ্চিন্তে রাজ্যপাট ভোগ করে সময় কাটিয়ে দিয়ে এখন চাপের মুখে পড়ে তারা ঘোষণা করেছে রাজারহাটের মানুষদের জন্য আট দফা প্রকল্প। এই প্রকল্প তারা কবে কার্যকর করবে? জমি অধিগ্রহণ করার পর ১৫ বছর পার হয়ে গেলেও যে সরকার কিছুই করেনি, সে আগামী দু'মাসে সব করে দেবে এ কথা শাসক দলের অন্ধ স্তাবক ছাড়া কে বিশ্বাস করতে পারে?

কী আছে এই আট দফা প্রকল্পে? আবাসন মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, রাজারহাটে দু'টি বাজার নির্মাণ করা হবে এবং এই নির্মাণে জমিহারা মানুষ কাজ পাবে। কাজ পাওয়ার কথা শুনলেই কিছু মানুষ 'উন্নয়ন' 'উন্নয়ন' বলে সমর্থন করতে থাকেন। কিন্তু যে ছিল জমির মালিক তার জমি কেড়ে নিয়ে তাকে দিনমজুরে পরিণত করা কি উন্নয়ন? আজ না হয় বাজার নির্মাণে কাজ করবে, কিন্তু বাজার নির্মাণ শেষ হয়ে গেলে কোথায় কাজ করবে এই দিনমজুররা? তার কোনও নিশ্চয়তা কি গৌতমবাবুরা দিতে পারেন?

গৌতমবাবুদের দ্বিতীয় প্রকল্প হল, বাজারে কিছু স্টল জমিদাতাদের দেওয়া হবে। পুঁজির অভাব হলে তাদের ঋণ দেবে হিডকো। হাজার হাজার চাষি উচ্ছেদ হয়েছে। ক'জন স্টল পাবে? স্টল পেলেও প্রতিযোগিতার বাজারে জমিহারারা কতদূর দাঁড়াতে পারবে? এই বিষয়গুলি গভীরে ভেবে দেখা দরকার।

গৌতমবাবুদের তৃতীয় প্রকল্প হল, বাস কেনা। রাজারহাটের নিউটাউনের বিভিন্ন এলাকায় ২০টি বাস চালাবে হিডকো। তার মধ্যে হিডকোর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ১০টি বাস চালাবেন জমিহারা পরিবারের লোকজন। ১০টি বাসে কতজন লোক কাজ পাবে? ড্রাইভার, কনডাক্টর, ক্লিনার ধরে বড়জোর ৩০ জন। উচ্ছেদ হল হাজার হাজার, কাজ পাবে মুষ্টিমেয়। এর নাম তাঁরা দিয়েছেন জমিহারাদের জন্য বিরাট কিছু করা। সত্যিই গরিব মানুষের প্রতি কী নির্মম পরিহাস!

গৌতমবাবুদের চতুর্থ প্রকল্প হল, ট্রাফিকম্যান নিয়োগ। নিউটাউনের রাস্তায় ট্রাফিকগার্ড ও নিরাপত্তারক্ষীর জন্য ভবিষ্যতে নাকি প্রচুর লোক লাগবে। গৌতমবাবু ঘোষণা করেছেন, এর মধ্যে ১০০ জন যুবক-যুবতীকে নেওয়া হবে জমিহারা পরিবার থেকে। কেন মাত্র ১০০ জন? কেন বেশি নেওয়া হবে না? গৌতমবাবুরা জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পেরেছেন হাজার হাজার মানুষকে। এখন দারোয়ানের কাজটুকুও দিতে তাদের এত কার্পণ্য?

গৌতমবাবুরা ঘোষণা করেছেন, জমি হারিয়ে যারা অসংগঠিত শ্রমিক হয়েছেন, তাদের প্রভিডেন্ট ফান্ডে টাকা দিতে হবে না। প্রভিডেন্ট ফান্ডের যে অর্থ শ্রমিককে দিতে হয়, সেই অর্থ দেবে হিডকো। কতদিন দেবে এই অর্থ? দেবে মাত্র পাঁচ বছর। তারপর কী হবে, এর কোনও উত্তর নেই। তাছাড়া দেবে বলেও শেষপর্যন্ত দেবে কি না তার কী নিশ্চয়তা আছে? হিডকো টাকা না দিলে রাজ্য সরকার কী ব্যবস্থা নেবে? এ রাজ্যে অসংখ্য নজির আছে মালিকরা পিএফের টাকা গায়েব করে দিলেও সিপিএম সরকার মালিকদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।

গৌতমবাবুদের ষষ্ঠ প্রকল্প হল, জমিহারা পরিবারগুলির মহিলাদের নিয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠী করা। এই মহিলারা যে সব জিনিস হাতে তৈরি করবেন তা বিক্রির জন্য রাজারহাটে দু'টি শোরুম নির্মাণ করে দেবে হিডকো। কারা কিনবে তাঁদের জিনিস? বলা হয়েছে বিমানবন্দরে যাওয়ার পথে বহিরাগতরা এইসব শোরুম থেকে জিনিস কেনাকাটা করবে। সত্যিই গৌতমবাবুদের এই কল্পনা আকাশে শিল্প করার মতো। একচেটিয়া পুঁজির আগ্রাসী দাপটের সামনে যেখানে প্রতিষ্ঠিত মাঝারি ও ক্ষুদ্র পুঁজি ব্যবসায় দাঁড়াতে পারছে না, সেখানে এই মহিলাদের পুঁজির স্বনির্ভর প্রকল্প প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারবে? বাজারে প্রতিযোগিতায় টেঁকা তো দূরের কথা এরা বাজারে ঢুকতেই পারবে না। ইতিমধ্যেই স্বনিযুক্তি প্রকল্পের হাজার হাজার বেকার যুবক সর্বস্ব হারিয়েছেন। সেরকম ফাঁদেই গৌতমবাবুরা মহিলাদের ফেলতে চাইছেন। এর দ্বারা কোনও মহিলাই স্বনির্ভর হতে পারেন না। এর দ্বারা ঋণের বোঝা বাড়বে এবং তার পরিণাম যে নির্মম, ঋণের দায়ে এ রাজ্যের বহু মানুষের আত্মহত্যার ঘটনা তা মনে করিয়ে দেয়।

তাদের সপ্তম প্রকল্প হল, যে সমস্ত মানুষ জমির টাকা নেননি, কোর্ট থেকে সেই টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে হিডকো বিনামূল্যে উকিল নিয়োগ করবে।

অষ্টম প্রকল্প হল, উচ্ছিন্ন সংখ্যালঘু মুসলমানরা যাতে সহজে ওবিসি সার্টিফিকেট পেতে পারে, তার ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু এই সার্টিফিকেট দ্বারা কি চাকরি মিলবে?

এই যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ আবাসনমন্ত্রী গৌতম দেব ও বুদ্ধদেববাবুরা ঘোষণা করেছেন, শেষ পর্যন্ত তার দ্বারা স্থায়ী উপার্জনের ব্যবস্থা কতজনের হবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। জমি থাকার সময় চাষিদের পর্যায়ক্রমিক ফসলের যে নিশ্চয়তা ছিল, স্থায়ী পুঁজি হিসাবে যে জমি ছিল সবই কেড়ে নিয়ে সরকার ২৫টি গ্রামের হাজার হাজার মানুষকে এক অন্তহীন অনিশ্চয়তার মহাসাগরে ফেলেছে। এদের মনুষ্যসম্মত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা সরকারকে করতেই হবে। যদি না করে তবে সবহারা এই মানুষরা লড়াইয়ের হাতিয়ার তুলে নিয়ে শেষ দেখতে তো চাইবেনই।

মার্কিন বিচারবিভাগের ৬০০ পাতার গোপন রিপোর্ট ফাঁস

খুনি নাৎসি ক্রিমিনালদের সঙ্গে মার্কিন শাসকদের আঁতাত প্রমাণিত

আন্তর্জাতিক ন্যুরেমবার্গ ট্রায়াল বা বিচারের ৬৫ বছর পূর্তি হল এ বছর এবং এ বছরই খোদ মার্কিন বিচারবিভাগের ৬০০ পাতার এক গোপন রিপোর্টে সম্প্রতি ফাঁস হয়ে গেল যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দশ হাজারের মতো অত্যাচারী খুনে যুদ্ধাপরাধী নাৎসি নেতাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ গোপনে নিজেদের দেশে আশ্রয় দিয়েছিল, যা যুদ্ধাপরাধের সামিল। আমেরিকার এই অপকর্ম সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য, এমনকী আশ্রয়প্রাপ্ত নাৎসি ক্রিমিনালদের নাম বহু আগে থেকেই নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু খোদ মার্কিন বিচারবিভাগের রিপোর্টে আগে কখনও এ সব ষড়যন্ত্রের খবর প্রকাশিত হয়নি। ফলে, বিচারবিভাগের এই রিপোর্টের আলাদা একটা গুরুত্ব রয়েছে এবং দেখা যাচ্ছে, ইতিপূর্বে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ হয়ে পড়া তথ্যগুলি যথার্থই ছিল।

১৯৪৫ সালের ২০ নভেম্বর থেকে ১৯৪৬-এর ১ অক্টোবর পর্যন্ত জার্মানির ব্যাভেরিয়ায় ন্যুরেমবার্গ শহরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছিল হিটলারের নাৎসি বাহিনীর জল্লাদ গেস্টাপো কর্তাদের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে এরা অস্ত্রের জোরে দেশের পর দেশ দখল করে সেই দেশগুলির মানুষকে নাৎসিদের দাসে পরিণত করেছিল, অ-জার্মান বিশেষ করে ইহুদি বংশোদ্ভূত হাজার হাজার মানুষকে পাইকারি হারে অত্যন্ত নৃশংসভাবে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করেছিল। দুনিয়ার বুক থেকে 'নোংরা ইহুদিদের' নিশ্চিহ্ন করাই ছিল তাদের কর্মসূচি। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল ভয়ঙ্করতম যুদ্ধ ও বীভৎস অত্যাচার। সমগ্র বিশ্বযুদ্ধে যেখানে প্রাণ গিয়েছিল প্রায় পাঁচ কোটি মানুষের, সেখানে শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নই হারিয়েছিল ২ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ। সারা সোভিয়েতে এমন কোনও পরিবার ছিল না, যার কেউ না কেউ যুদ্ধে নিহত হয়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত জনগণ ও সোভিয়েত লালফৌজের কাছেই কুখ্যাত নাৎসি বাহিনীকে পরাস্ত হতে হয়। তারা শুধু নিজেদের দেশকেই মুক্ত করেছে তা নয়, বিশ্ব মানবসভ্যতাকেও রক্ষা করেছে নাৎসিদের ভয়াবহ বর্বরতা ও দাসত্বের কবল থেকে। লালফৌজ বিভিন্ন দেশ থেকে এই কুখ্যাত জল্লাদবাহিনীকে তাড়িয়ে নিয়ে খোদ জার্মানির রাজধানী বার্লিনে পৌঁছায় ও তাদের পার্লামেন্ট 'রাইখস্ট্যাগ'-এর উপর উড়িয়ে দেয় বিজয় পতাকা। এরপর, হিটলারের নাৎসি বর্বরতার হাত থেকে বিশ্বকে রক্ষার লড়াইতে তারাও আছে — দেখাতে বনেদি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ব্রিটেন এবং উঠতি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র আমেরিকা বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক বাহিনী নিয়ে হাজির হয় বার্লিনে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আমেরিকা ও ব্রিটেন মিত্রশক্তির মধ্যে থাকলেও গোটা বিশ্বযুদ্ধের কালে সোভিয়েতের বারংবার আহ্বান সত্ত্বেও তারা সময়মতো 'দ্বিতীয় ফ্রন্ট' খুলে হিটলার-বাহিনীকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলতে চায়নি। বরং প্রতি মুহূর্তেই এমন ভূমিকা গ্রহণ করেছে, যাতে নাৎসি বাহিনীর আক্রমণে সোভিয়েত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত তাদের সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা যখন পূরণ হল না, সোভিয়েত একক ক্ষমতাতেই নাৎসি বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে যখন একেবারে নাৎসিদের ঘাঁটিতে গিয়ে দখল নিচ্ছে, তখনই তারা নাৎসি-বিরোধী চ্যাম্পিয়ন সাজতে ময়দানে হাজির হয়। এই হল ইতিহাস। এরপরই 'লিগ অফ নেশনস'-এর উদ্যোগে গঠিত আন্তর্জাতিক আদালতে শুরু হয় যুদ্ধাপরাধী নাৎসি জল্লাদদের বিচার।

ন্যুরেমবার্গ ট্রায়াল পরিণত হয় বিরাট প্রহসনে

আমেরিকা বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে চ্যাম্পিয়ন হিসাবে নিজেদের প্রচার করে। অথচ সেদিন ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালে উপস্থিত আন্তর্জাতিক বিচারকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য আর ক্রিয়েগার বলেছিলেন ঃ ''আন্তর্জাতিক বিচারকমণ্ডলী গোটা গেস্টাপো সংগঠনটিকে অপরাধমূলক সংস্থা হিসাবে ঘোষণা করে তার আট লক্ষ সদস্যকে অপরাধী সাব্যস্ত করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর অধিকাংশ দাগী যুদ্ধাপরাধী গা ঢাকা দিয়ে আত্মগোপন করে। মাত্র ৮৭ হাজার ৭৬৫ জনকে বিচারে হাজির করা হয়। শুনানি শুরুর কয়েকদিন পর ৭৯ হাজার ৬৩৮ জনকে প্রমাণাভাবে ছেড়ে দিতে হয়। শেষ পর্যন্ত ৬ হাজার ৪৫৭ যুদ্ধাপরাধীকে অভিযুক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়। তাদের মধ্যে ৫১৪ জনের থেকে জরিমানা আদায় করে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে মুক্তি দেওয়া হয়। ১ হাজার ৬৭১ জন অভিযুক্ত নাৎসি যুদ্ধাপরাধী তিন বছর কারাবাসের পর 'রহস্যজনক' কারণে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে যায়। ন্যুরেমবার্গ ট্রায়াল পরিণত হয় বিরাট প্রহসনে। এর জন্য দায়ী আংশিকভাবে ব্রিটেন ও সম্পূর্ণভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কারণ, এই দুটি দেশ ট্রায়াল শুরুর থেকেই নানা গণ্ডগোল পাকিয়ে ন্যায্য বিচারের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করেছে। এর ফলে মানব সভ্যতার ঘৃণ্যতম অপরাধীরা জঘন্যতম অপরাধ করেও নিস্তার পেয়ে গেল। সভ্যতার ইতিহাসে এই ঘটনা একটা নগ্ন নিদর্শন হয়ে রইল।'' যাদের ছেড়ে দিতে হয়েছে তাদের অন্যতম ছিল কুখ্যাত গ্যাস চেম্বারের আবিষ্কারক ফ্রেডরিখ প্যানজিঙ্গার। অধস্তন আইখম্যান সেই পরিকল্পনা কার্যকর করে। এ ছাড়াও ছেড়ে দিতে হয়েছে জার্মান গোয়েন্দা সংস্থার তৎকালীন কর্তা এবরাফ জুবের, পূর্বাঞ্চলের রণক্ষেত্রে নাৎসি বাহিনীর গোয়েন্দা প্রধান রাইনার্ড গেহলেন, দক্ষিণ জার্মানির গেস্টাপো চিফ উইলি ক্রিচবাউম, বুদাপেস্ট-এর গেস্টাপো চিফ জোসেফ অ্যাডলফ আরবান, কিয়েল-এর গেস্টাপো চিফ ফ্রিৎজ স্মিড, গেস্টাপো বাহিনীর পঞ্চম ডিভিশনের অধিকর্তা এমিল আউসবার্গ, রুশ-জার্মান সীমান্তবর্তী নাৎসি অধিকৃত অঞ্চলসমূহের গেস্টাপো চিফ হারমান হুবিগ, পোল্যান্ডের সোবিবর কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের গণহত্যার কুখ্যাত নায়কদ্বয় হুবার্ট গোমেরেস্কি ও কার্ল ফ্রেনজি প্রমুখকে। এরা সব আশ্রয় নিয়েছিল নিরাপদ আস্তানা আমেরিকায়। এদের নাম বদলে দিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা নিজেদের গোয়েন্দাবাহিনী সিআইএ এবং সামরিকবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে নেয় এবং দেশে দেশে মার্কিন হানাদারি চালানোর ক্ষেত্রে তাদের ব্যবহার করে।

গেস্টাপো কর্নেল ক্লস বারবির স্বীকারোক্তি

মার্কিন দেশে আশ্রয় পাওয়া এমনই একজন হল ক্লস বারবি। ১৯৮৩ সালের ১৩ জানুয়ারি বলিভিয়ার রাজধানী লাপাজ-এ সে ধরা পড়ে, অর্থসংক্রান্ত একটি মামলার অভিযুক্ত হিসাবে। তদন্ত করতে গিয়ে তার প্রকৃত পরিচয় ফাঁস হয়ে যায়। তার স্বীকারোক্তি থেকে জানা গেছে, হিটলারের নাৎসি পার্টিতে সে উচ্চপদে আসীন ছিল। গেস্টাপো বাহিনীতে কর্নেল পদে আসীন ছিল সে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসিবাহিনী দক্ষিণ ফ্রান্স দখল করে নিলে ১৯৪৩-এর শেষদিকে দক্ষিণ ফ্রান্সের গেস্টাপো বাহিনীর প্রধান হয়ে বার্লিন থেকে উড়ে আসে ক্লস বারবি। তার বিরুদ্ধে ১৯৪৩-৪৫ — ফ্রান্সে ত্রিশ হাজার মানুষ খুনের অভিযোগ। যুদ্ধশেষে নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করতে দক্ষিণ ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা প্রায় পাঁচ হাজার গেস্টাপো লিয়ঁ হেডকোয়ার্টারে এক গোপন সভায় মিলিত হয়। সেদিনের বৈঠকে মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ 'অ্যামেরিকান স্ট্র্যাটেজিক সার্ভিস' (সি আই এ-র পূর্বতন নাম)-এর কর্তা মি. ইয়ং উপস্থিত ছিলেন। যাঁর আসল নাম অ্যালান ডালেস। সেইদিনের গোপন বৈঠকে উপস্থিত থেকে অ্যালান ডালেস গেস্টাপো নেতা-কর্মীদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন, বিনিময়ে তাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে গোয়েন্দাগিরি চালানোর কাজ করতে হবে। গেস্টাপোরা এই প্রস্তাব মেনে নিয়ে মার্কিন বিমানবাহিনীর বিমানে আমেরিকায় পাড়ি দেয়। যুদ্ধের পর সিআইএ গঠিত হলে তার কর্তা হলেন অ্যালান ডালেস। ক্লস বারবি তখন পিটার হান্স ছদ্মনামে সিআইএ-র প্ল্যানিং ডিভিশনের কর্তা হয়ে বসে। দেশে দেশে সামরিক অভ্যুত্থানের পরিস্থিতি তৈরি করে তাকে সফল রূপ দেওয়ার কাজ হল এই প্ল্যানিং ডিভিশনের। ১৯৫৪-৬৯ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে সফল সামরিক অভ্যুত্থানের কলকাঠি নেড়ে ক্লস বারবি রেকর্ড সৃষ্টি করে। লাতিন আমেরিকার নানা দেশে নজরদারির জন্য ক্লস বারবি ১৯৭২ সালে ক্লস অস্টাম্যান নামে বলিভিয়ায় আসে। সেখানে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোর ব্যবস্থা করে। *(সূত্র ঃ এল ফিগারো, প্যারিস, ১৩-০২-১৯৮৩)*

নাৎসি ক্রিমিনালদের সঙ্গে মার্কিন থার্ড আর্মির নেতা জর্জ প্যাটন-এর গোপন বৈঠক

ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালের ঠিক ১০ দিন আগে ১৯৪৫-এর ১০ নভেম্বর জার্মানির দক্ষিণাংশে নোপেৎজিগ শহরের উপকণ্ঠে বন্দীশিবিরের এক অংশে রুদ্ধদ্বার কক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বক্তা ছিলেন মার্কিন থার্ড আর্মির নেতা জর্জ প্যাটন। শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত নাৎসি অধিকৃত পূর্ব ইউরোপের পূর্বতন নাৎসি প্রশাসক গেরহার্ট ভনমনডে, গেস্টাপো চিফ ফ্রানৎজ সিক্স, নাৎসি গোয়েন্দা সংস্থার অধিকর্তা রাইনহার্ড গেহলেন, বাইলো রাশিয়ার নাৎসি পুতুল সরকারের প্রধান এমানুয়েল জাসুকি, কুখ্যাত পুলিশ অধিকর্তা ফ্রানৎজ কুশেল প্রমুখ জনা ত্রিশেক কুখ্যাত নাৎসি যুদ্ধাপরাধী।

প্যাটন এবং তৎকালীন মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার অধিকর্তা ফ্রাঙ্ক উইসনার দুজনে মিলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের কাছে নোট পাঠিয়েছিলেন। জর্জ প্যাটন তাঁর নোটে লেখেন, '... আমি মনে করি, অতি শীঘ্রই আমরা আর একটা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ব। সেই যুদ্ধটি হবে আমাদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের। নাৎসিরা কমিউনিস্টদের অত্যন্ত ঘৃণা করে। এক্ষেত্রে কমিউনিস্টরা আমাদের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও নাৎসি) উভয়েরই শত্রু। সুতরাং অযথা দেরি না করে নাৎসিদের সঙ্গে একটা গোপন বোঝাপড়া গড়ে তোলা একান্ত জরুরি।' মার্কিন বিমানবাহিনীর বিমানে এই যুদ্ধাপরাধী নাৎসি অফিসারদেরও গোপনে আমেরিকায় উড়িয়ে আনা হয় এবং তাদের মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ারের সময় গোয়েন্দাবিভাগ ও সামরিক বিভাগে নিয়োগ করা হয়।

ডাঃ জোসেফ মেংলে

সুপরিচিত অস্ট্রেলিয়ান সাংবাদিক-লেখক উইলফ্রেড বার্চেট তাঁর বিশ্বখ্যাত 'দ্য জার্ম ওয়ারফেয়ার' গ্রন্থে ডাঃ জোসেফ মেংলে-র পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন, ''পৃথিবীর এক নিষ্ঠুরতম ভয়ঙ্কর শয়তান, জীবিত মানুষের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে যার বুক এতটুকু কাঁপে না, ফুলের মতো নিষ্পাপ শিশুদের রক্তাক্ত শরীরের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে যে তার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সফলতা পর্যবেক্ষণ করে, অসহায় রোগীদের অপ্রয়োজনীয় মনে করে তাদের গণকবরস্থ করে। এরকম মানবরূপী এক রোবটের নাম ডাঃ জোসেফ মেংলে। আর এই শয়তানটি হচ্ছে আধুনিক জীবাণু যুদ্ধের আবিষ্কারক, পিতা'।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে, ১৯৪৫-এর ৭ মে সংবাদসংস্থা রয়টার প্রচারিত একটি খবরে পৃথিবীর সমস্ত সুস্থ মানুষ চমকে উঠেছিল। খবরটির শিরোনাম ছিল, 'জার্মান সরকারের তত্ত্বাবধানে আউসউইচ কনসেনট্রেশন শিবিরে নারকীয় হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে'। খবরে বলা হয়েছিল ঃ ''পোল্যান্ড-জার্মানির সীমান্তে অবস্থিত বন্দী চার লক্ষ অসহায় মানুষের উপর নানা রকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে গিয়ে ওই শিবিরের আবাসিক ডাক্তার জোসেফ মেংলে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় এই গণহত্যা চালিয়েছে''।

ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালের চার বছর পর ১৯৫০ সালের প্রথম দিকে মালয়েশিয়ান 'সানডে টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে বলা হয়, আউসউইচ নাৎসি কনসেনট্রেশন শিবিরের ডাক্তার জোসেফ মেংলের পরীক্ষা-নিরীক্ষা লব্ধ কারিগরী কুশলতার সাহায্য নিয়ে কোরিয়ার উপর জীবাণু যুদ্ধের কলা-কৌশল প্রয়োগ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

মার্কিন সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দা শাখা সিআইএ-র প্রাক্তন অফিসার গোরবি বেঞ্জামিন-এর বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, সিআইএ-র সাহায্যে ডাঃ মেংলে আর্জেন্টিনা, চিলি, বলিভিয়া, প্যারাগুয়ে ইত্যাদি দেশে অবস্থান করেছে ডাঃ যোসেফ মেংকা, গ্রেগ সিখানস্ট্রো, ডাঃ হেলমুট গ্রেগরি, ফস্টো রিনডন, এডলার ফ্রেডরিখ, ডন ব্রাইটন বাচ, ওয়াল্টার হাস্ফ ইত্যাদি ছদ্মনামে। *(সূত্র ঃ ফ্রান্সের 'লা মার্টিন' এবং স্পেনের 'এশিকি-আফ্রিকি')*

নাৎসি ক্রিমিনালকে জেল থেকে ছাড়াতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রেগনের দরবার

ন্যুরেমবার্গে আন্তর্জাতিক আদালতে নাৎসি দলের ডেপুটি ও হিটলারের সহচর রুডল্ফ হেস-এর যাবজ্জীবন কারাদন্ড হয়। কিন্তু ১৯৫৯ সালে তদানীন্তন পশ্চিম জার্মান সরকারের কাছে সে জেল থেকেই আবেদন জানায় যে, তাকে মুক্তি দেওয়া হোক ও সাংবিধানিক অধিকার প্রদান করা হোক। সরকার তার দাবি খারিজ করে দেয়। সে ফেডারেল কোর্টে আবেদন করলে সেখানেও তার দাবি নাকচ হয়ে যায়। বিচারপতি বলেন, আন্তর্জাতিক আদালত কর্তৃক অভিযুক্ত এমন একজন জঘন্যতম যুদ্ধাপরাধীর কোনও রকম সাংবিধানিক অধিকার আছে বলে ফেডারেল কোর্ট মনে করে না।

অথচ, মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হওয়ার পরই রোনাল্ড রেগন পশ্চিম জার্মানির চ্যান্সেলার বা রাষ্ট্রপ্রধানকে লিখিত এক পত্রে রুডল্ফ-এর কেস পুনর্বিবেচনার অনুরোধ করে লেখেন ঃ 'যে কোনও মানুষ সে যত বড় অপরাধীই হোক না কেন, তাকে তার মানবিক ও সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। এই ক্ষেত্রে রুডল্ফ হেসকেও তার মানবিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া উচিত বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি।' একটা আন্তর্জাতিক ক্রিমিনালের প্রতি মার্কিন রাষ্ট্রপতির এ হেন দরদের কারণ সহজেই বোঝা যায়। পশ্চিম জার্মানির কারাগার থেকে ছাড়িয়ে আনতে পারলে হিটলারের এই খুনে সহচরটি মার্কিন শাসকদের 'সম্পদ' হয়ে উঠবে। *(সূত্র ঃ ফ্রাঙ্কফুর্টার গার্ডিয়ান, ১০-০৫-১৯৮১)*

চারের পাতায় দেখুন

বাঁকুড়া বিদ্যুৎ গ্রাহকদের দাবি আদায়

বিদ্যুতের ব্যাপক মাশুল বৃদ্ধি, লোডশেডিং, বেআইনি অতিরিক্ত সিকিউরিটি আদায় প্রভৃতির বিরুদ্ধে ও খরা দুর্গত জেলা হিসাবে কৃষিতে ভরতুকি, বোরো মরশুমে চাষিদের বিদ্যুতের লাইন কাটা বন্ধ প্রভৃতি দাবিতে ১৪ ডিসেম্বর বাঁকুড়ায় পাঁচ শতাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহকের প্রতিবাদ মিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশ-অনুষ্ঠিত হয়।

জেলার বিভিন্ন গ্রাম ও শহর থেকে আসা বিদ্যুৎ গ্রাহকদের প্রতিবাদ মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে মাচানতলায় মূল মঞ্চের সামনে এসে সমবেত হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত সভার মূল বক্তা ছিলেন অ্যাবেকার রাজ্য সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাস। তিনি অতিরিক্ত সিকিউরিটি চার্জের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সাফল্য তুলে ধরেন। সভাপতিত্ব করেন জেলা সভাপতি কমলাকান্ত কর্মকার। অন্যান্য নেতৃবৃন্দও বক্তব্য রাখেন। সেখান থেকে গ্রাহকরা মিছিল করে পুলিশি বাধা অতিক্রম করে ডি এম অফিসের সামনে পৌঁছে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। সঞ্জিত বিশ্বাসের নেতৃত্বে ৭ জনের এক প্রতিনিধি দল অতিরিক্ত সিকিউরিটি চার্জ প্রত্যাহার সহ ১৪ দফা দাবিতে অতিরিক্ত জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দেন। আন্দোলনের চাপে তিনি গুরুত্বপূর্ণ দুটি দাবি মেনে নেন — ১) বোরো চাষ চলাকালীন কোনও মতেই বিদ্যুৎ লাইন কাটা হবে না, ২) সুইড পারমিশনে চাষিদের অযথা হয়রানি বন্ধ করা হবে। অন্য দাবিগুলি বিদ্যুৎ কোম্পানির সাথে আলোচনা করে গ্রাহকদের জানাবেন।

রবীন্দ্রনাথ-শরৎ-নজরুলের অবদান বিষয়ক আলোচনা সভা

বর্তমান প্রজন্মের ছাত্র-যুবকেরা নাকি কোনও সিরিয়াস আলোচনা শুনতে চায় না। ১২ ডিসেম্বর হাওড়া যোগেশচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ে 'ভারতবর্ষের নবজাগরণ —রবীন্দ্রনাথ-শরৎ-নজরুলের অবদান' শীর্ষক আলোচনায় তরুণ প্রজন্মের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ও মনোযোগ দিয়ে বক্তব্য শোনা দেখিয়ে দিল এ কথা সর্বাংশে সত্য নয়। 'পথের দাবী' সাংস্কৃতিক সংস্থা এই আলোচনার আয়োজন করেছিল। সুদীপ মুখোপাধ্যায়ের দেশাত্মবোধক গানের মধ্য দিয়ে সভার সূচনা হয়। সভাপতি বিশিষ্ট আইনজীবী ও হাওড়া বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুমন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন। আমন্ত্রিত বক্তা সারা বাংলা সার্ধশত রবীন্দ্র জন্মবর্ষ উদযাপন কমিটির সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, অত্যাচার ও দস্যুবৃত্তির বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ ভূমিকা এবং শরৎচন্দ্র-নজরুলের পার্থিব মানবতাবাদী চিন্তার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। উপস্থিত ছিলেন ছাত্র যুবক সহ প্রায় ২০০ জন। পরে শ্রোতাদের কিছু প্রশ্ন নিয়েও আলোচনা হয়।

এলাহাবাদে ছাত্র সম্মেলন

ছাত্র সংসদ গড়তে না দেওয়ার সরকারি পরিকল্পনা, শিক্ষার ব্যবসায়ীকরণ, বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধতা সহ অন্যান্য দাবিতে ৩ ডিসেম্বর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সমাবেশের একাংশ

পুরুলিয়ায় এস টি-এস সি স্টুডেন্টস অ্যাকশন কমিটির কনভেনশন

শিক্ষার সার্বিক বাণিজ্যিকিকরণ, জঙ্গলমহলে যৌথবাহিনীর অত্যাচার প্রতিরোধ এবং তপশিলি জাতি-উপজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের দীর্ঘ সংগ্রামের অর্জিত অধিকার রক্ষার্থে ১৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হল পুরুলিয়া জেলা এস টি-এস সি স্টুডেন্টস অ্যাকশন কমিটির দ্বিতীয় কনভেনশন। কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য বর্জুরাম সিং সর্দার, রাজেন টুডু, দয়াময় ভট্টাচার্য ও কমিটির রাজ্য কনভেনর সুজিত পাত্র, সার্ধশতবর্ষ হুল উদযাপন কমিটির সম্পাদক বিসম্বর সিং মুড়া।

এস টি-এস সি ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেন্ড, বুকগ্র্যান্ট এবং সার্টিফিকেট পাওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা সহ আদিবাসী ছাত্রাবাসগুলির বেহাল অবস্থা সমাধানে আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিজয় সিং মুড়াকে সভাপতি এবং দ্বারিক সিং মুড়া ও তরুণ বাউরিকে যুগ্মসম্পাদক করে ৩৪ জনের কমিটি গঠিত হয়।

নাৎসি রিপোর্ট ফাঁস

তিনের পাতার পর

নাৎসি ক্রিমিনালদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুনর্বাসন দেওয়ার কৌশল

নাৎসি ক্রিমিনালদের এখানে ওখানে গোপনে রাখা হচ্ছিল। তাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যাপারে বাধা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুনর্বাসন আইন, এবং পুনর্বাসন দিতে প্রয়োজনীয় বিপুল অর্থের সংস্থান।

তাদের বৈদেশিক নাগরিক সংক্রান্ত আইনে ছিল, কোনও বিদেশি নাগরিক যদি একনাগাড়ে পাঁচ বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করেন সেক্ষেত্রে তিনি আবেদন জানালে তাঁকে মার্কিন নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। এই আইন তড়িঘড়ি সংশোধনের জন্য সেনেট এবং হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস-এর সভা আহ্বান করা হয়। এক তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত না থাকা সত্ত্বেও মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে বৈদেশিক নাগরিক সংক্রান্ত আইনটিকে সংশাধন করে নেওয়া হয়, ১৯৫২ সালের ডিসেম্বরে। সংশোধিত আইনে বলা হল, কোনও বাস্তুচ্যুত বিদেশি নাগরিক যদি মার্কিন নাগরিক অধিকার অর্জন করতে চান, তবে তাঁকে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে।

এরপর মার্কিন প্রশাসন নিউ ইয়র্ক শহর থেকে ৬০০ কিমি পশ্চিমে সাউথ রিভার অঞ্চলে জঙ্গল কেটে গড়ে তোলে নাৎসি অপরাধীদের জন্য নয়া বসতি। সাউথ রিভার পুরসভার প্রথম চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছিল ইহুদি অধ্যুষিত রিগার হত্যাকাণ্ডের কুখ্যাত জল্লাদ কার্ল ডেটলাভস।

পুনর্বাসন দিতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন মেটানো হয়েছিল গোপনে। একটি বেসরকারি সংস্থা গঠন করে তাদের উপর নাৎসি অপরাধীদের পুনর্বাসনের ভার দেওয়া হয়। এই সংস্থার অর্ধেক অর্থ জোগানের দায়িত্ব দেওয়া হয় সিআইএ এবং পেন্টাগনকে। সংস্থাটির নাম দেওয়া হয় 'ক্রুসেড ফর ফ্রিডম'। সদস্য হিসাবে এই সংস্থায় ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার, প্রাক্তন গোয়েন্দা অধিকর্তা ফ্রাঙ্ক উইসনার, মার্কিন অধিকৃত দক্ষিণ জার্মানির প্রাক্তন মিলিটারি গভর্নর অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল লুইসিয়াস ডি ক্লে এবং রোনাল্ড রেগন। এই রেগন পরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হন।

মার্কিন সমরশিল্প প্রকল্পের পিছনে নাৎসি যুদ্ধাপরাধীদের অবদান

বিশ্বে অস্ত্রের বাজারের বিরাট অংশ দখল করে আছে মার্কিন অস্ত্র নির্মাণকারী প্রায় বিশটি কোম্পানি — লকহিড, এম বি বি ট্যাঙ্ক ম্যানুফ্যাকচারার্স, আমেরিকান অ্যারো-স্পেস, ওয়ার হার্ডওয়ার ম্যানুফ্যাকচারার্স, আমেরিকান ইলেক্ট্রিক্যালস প্রভৃতি। এই কোম্পানিগুলোকে নিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে মার্কিন দুনিয়ার বুকে গড়ে উঠেছে দৈত্যাকার 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিলিটারি কমপ্লেক্স'। একে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার বলেছিলেন, 'প্রাইড অব মডার্ন আমেরিকা'। এই সমরশিল্প প্রকল্প গড়ে তুলতে যার প্রধান অবদান, সে হচ্ছে 'নাৎসি জার্মানির সমরায়োজনের অন্যতম স্তম্ভ' ফ্রানজ জোসেফ স্ট্রস।

উল্লেখ্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর বহু আগে থেকেই মার্কিন পুঁজিপতিরা হিটলারের সমরায়োজনে সহায়তা দিয়ে আসছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত ও পর্যুদস্ত জার্মানির উপর বিজয়ী ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স চাপিয়ে দিয়েছিল চরম অপমানজনক ভার্সাই চুক্তি। তবু সেই জার্মানি মাত্র ১২-১৩ বছরের মধ্যেই এত দ্রুত সামরিক দিক থেকে ক্ষমতাশালী ও আগ্রাসী হয়ে উঠতে পেরেছিল, তার অন্যতম প্রধান কারণ, একেবারে প্রথম থেকেই তারা ধারাবাহিকভাবে বৈদেশিক অর্থ সাহায্যে পুষ্ট হয়েছে। এই সহায়তার ক্ষেত্রে প্রথম নাম করতে হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। তারা জার্মান শিল্পে বিশেষত তাদের সমরাস্ত্র নির্মাণ শিল্পে ব্যাপক অর্থলগ্নি করেছিল। বৈদেশিক ঋণের শতকরা ৭০ ভাগই ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। হিটলার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের পুঁজি স্রোতের মতো ঢোকে জার্মানির সমরশিল্পে। *(সূত্র ঃ আত্মজীবনী, মার্শাল ঝুকভ)*। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত মার্কিন শিল্পপতিরা জার্মানিতে ১০০ কোটি ডলার লগ্নি করেছিল। *(সূত্র ঃ দাস ওয়ারস আর মেড, অধ্যাপক মর্ভেন)*। মার্কিন শিল্পপতিদের সহায়তায় জার্মানি ১৯৩৮ সালে কৃত্রিম জ্বালানি উৎপাদনের পরিমাণ ১৬ লক্ষ টনে নিয়ে যায়। *(সূত্র ঃ ইতিহাসের প্রখ্যাত অধ্যাপক ভিক্টর মাৎসুলেঙ্কু)*।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন নাৎসি জল্লাদ অফিসারদের সংগে নাৎসি জার্মান শিল্পপতিদের খুঁজে বের করে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, তখন মার্কিন কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত গোপনে জার্মান শিল্পপতিদের সংগে একটা অলিখিত চুক্তি করে। সেটা হচ্ছে, জোসেফ স্ট্রস ও অন্যান্য মার্কিন অধিকৃত জার্মানির সমর শিল্পপতিদের কলকারখানা ও যন্ত্রাদি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেবে মার্কিন কর্তৃপক্ষ এবং বিনিময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমরশিল্প গড়ে তোলার জন্য এরা পুঁজি ও কারিগরি বিদ্যা যোগাবে। মহান স্ট্যালিন যখন দুনিয়ার বুক থেকে ফ্যাসিস্ট শক্তিকে সম্পূর্ণ নির্মূল করে বিশ্ব মানবসভ্যতাকে রক্ষার মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, তখন নাৎসি জার্মানির সমর শিল্পপতিদের সাহায্যে মার্কিন মুলুকে দৈত্যাকার সমরশিল্প প্রকল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং এই ব্লুপ্রিন্টের রচয়িতা জোসেফ স্ট্রস।

বিভিন্ন মার্কিন অস্ত্র নির্মাণকারী কোম্পানির মধ্যে সবচাইতে বৃহৎ ও প্রাচীন কোম্পানি হল লকহিড। এই সংস্থার প্রারম্ভিক পুঁজি জোগান দিয়েছিল নাৎসি জার্মানির তিন সমর শিল্পপতি — ফ্রিক, ক্রস ও মাফে। এই লকহিড কোম্পানির প্রথম 'বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস'দের মধ্যে ছিল জোসেফ স্ট্রস এবং জার্মানির তিন সমর শিল্পপতি। নিরলসভাবে মার্কিন প্রশাসনের সেবা করার পুরস্কার স্বরূপ জোসেফ স্ট্রসকে ১৯৫৫ সালে পশ্চিম জার্মানির মন্ত্রীসভায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী করা হয়। পরে মার্কিন প্রশাসনের আনুকূল্যে সে যুদ্ধজোট 'ন্যাটো' সংস্থার সমর উপদেষ্টা পদে অধিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে সে পশ্চিম জার্মানির অঙ্গরাজ্য ব্যাভিরিয়ার প্রধানমন্ত্রী পদে বসে। *(সংবাদ সূত্র ঃ প্যারিস ম্যাচ, ২৫ জুলাই - ৮ আগস্ট, ১৯৮৬)*

এমনই হাজার হাজার নাৎসি জল্লাদকেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিজেদের গোয়েন্দা বিভাগ ও সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করেছিল। তাদের দিয়ে দেশে দেশে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে এবং সেই দেশগুলির সেনাকর্তাদের কিনে নিয়ে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ লুণ্ঠনের অপকর্ম চালিয়েছে। সেই প্রক্রিয়ারই সর্বশেষ শিকার আফগানিস্তান ও ইরাক। উত্তর কোরিয়া ও ইরানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তারা নানা অজুহাত উত্থাপন করছে ও হুমকি দিচ্ছে।

হিটলারের নাৎসি বাহিনীর বিরুদ্ধে মহান স্ট্যালিনের সংগ্রাম বিশ্ববাসীকে সকলপ্রকার বর্বরতা ও লুণ্ঠনের থেকে রক্ষা করতে, কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হিটলার বিরোধিতার মতলব ছিল, বিশ্বের বুকে হিটলারের পরিবর্তে তারাই একাধিপত্য চালাবে। তাই হিটলারের ধ্বংস তারা চেয়েছে, কিন্তু হিটলারের জল্লাদি কলাকৌশল নষ্ট হোক তা চায়নি। ফলে, স্ট্যালিনের নেতৃত্বে নাৎসি সমরশক্তির তৎকালীন প্রতিনিধি হিটলারের পরাজয় ঘটলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নাৎসি সমরশক্তির নতুন ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। 'বিশ্বসাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের শিরোমণি' মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজ 'দুনিয়ার বুকে যাবতীয় অনাচার-অবিচারের প্রতিমূর্তি। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মানবতা ও সার্বভৌমত্বের এরা পয়লা নম্বর শত্রু এবং সন্ত্রাসবাদের প্রধান মদতদাতা। তাই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রত্যেক বিশ্ববাসীর জরুরী কর্তব্য।

শরৎ কাহিনীর নাট্যরূপ

শরৎ কাহিনীর নাট্যরূপ দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে। গ্রাহকরা কলকাতা জেলা দপ্তরে বা নিচের ফোন নম্বরে যোগাযোগ করুন। আর গ্রাহক করা হচ্ছে না।

চারণিক,
ফোন ঃ ৯৪৩৩৪৪২১৪৬

শিশুরক্ত পান না করে পুঁজিবাদে 'উন্নয়ন' হয় না

প্রতি বছর নিয়ম করে শিশু দিবস পালন করা হয়ে থাকে। দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে রাজ্যে রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীদের শিশুপ্রেম নিয়ে সংবাদপত্রে খবর হয়। শিশুদের ফল মিষ্টি বিতরণ, শিশুদের কাছ থেকে পুষ্পস্তবক উপহার নেওয়ার ছবি ছাপা হয়। সরকারি বিজ্ঞাপনে শিশুদের কল্যাণে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত নানাবিধ প্রকল্পের বিবরণও ছাপা হয়। শিশুদের শিক্ষার সাংবিধানিক অধিকার, অপুষ্টি দূরীকরণ কর্মসূচির ফিরিস্তি, শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করে আইন করার নানা সুফল সম্পর্কেও প্রচার রাখা হয়। আর আইন না মানলে শাস্তির বিধানও দেশবাসীকে জানিয়ে দেওয়া হয়।

রাজ্য সরকারও শিশুকল্যাণের প্রকল্প রূপায়ণে যে কত তৎপর সে কথা সভা-সমিতিতে ও বিজ্ঞাপনে বহুল প্রচারিত। কিন্তু এইসব প্রচারের সঙ্গে বাস্তবের পার্থক্য অনেক। 'শিশুরাই জাতির ভবিষ্যত' এ কথাটা বক্তৃতায় এবং বিজ্ঞাপনের পক্ষে ভালো। ভোটের প্রচারের বিষয় হিসাবেও আকর্ষণীয় কম নয়। যদিও নতুন শতাব্দীর গোড়ায় জনগণনার রিপোর্ট অনুযায়ী, এই রাজ্যের শিশুশ্রমিক সংখ্যা ছিল আট লক্ষ। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতি বছর ৪৫ হাজার শিশু নিখোঁজ হয়ে যায়। এর চারভাগের একভাগ শিশুর খোঁজ কখনই পাওয়া যায় না। এই রাজ্যে বার্ষিক নিখোঁজ হওয়া শিশুর সংখ্যা ১৬ হাজার। যদিও প্রকৃত সংখ্যা আরও অনেক বেশি। এক সমীক্ষা থেকে দেখা যায়, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার ক্ষেত্রে পুলিশের কাছে অভিযোগ নথিভুক্ত করা হয় মাত্র ১৬.১৮ শতাংশ ক্ষেত্রে। মোট নিখোঁজের ৬৬.৬৭ শতাংশই হচ্ছে বালিকা, ৩৩.৩৩ শতাংশ বালক। সমীক্ষক সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী জানা যায়, আয়লা বিধ্বস্ত সুন্দরবন এলাকা থেকে শিশুরা পাচার হয়ে কলকাতার বিভিন্ন বাড়িতে কাজ করে শ্রমিক হিসাবে। সল্টলেক অঞ্চলেও এই সংখ্যা কম নয়। অবশ্য পাচার ও নিখোঁজ শিশুদের বেশিরভাগ অংশই চালান হয়ে যায় দিল্লিতে। প্রকৃতপক্ষে দিল্লির পরেই কলকাতার স্থান। পাচার ও নিখোঁজ হওয়া শিশুর সঠিক তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হল, এর সামান্য অংশই পুলিশের কাছে নথিভুক্ত হয়। এই বক্তব্য নারী ও শিশু সুরক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত এক সিআইডি অফিসারের। সমীক্ষা থেকে জানা যায়, খোঁজ পাওয়ার সমস্যাটা বেশ জটিল। কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মেয়েদের নাম ধাম পাল্টে দেওয়া হয়। কারণ তাদের ঠাঁই হয় পতিতাপল্লীতে। ছেলেদের ক্ষেত্রেও এই সমস্যা আছে (সূত্র ঃ দি স্টেটসম্যান, ১৯ অক্টোবর, ২০১০)।

যে দেশে বা যে রাজ্যে ৭০ ভাগের বেশি মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে, ঘরে ঘরে অনাহার যেখানে নিত্যসঙ্গী; খরা-বন্যা-ভাঙন ও নানা ধরনের বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব যেখানে বাৎসরিক ঘটনা সেখানে পরিবারগুলোর বাঁচার অবলম্বন কোথায়? সরকারের দুর্যোগ মোকাবিলায় ত্রাণ তো প্রধানত প্রতিশ্রুতিতেই সীমাবদ্ধ থাকে। আয়লার ক্ষেত্রেও তা পরিষ্কার দেখা গেছে। গ্রামে গ্রামে কাজ নেই। ১০০ দিনের কাজ ২৪ দিনে এসে ঠেকেছে। শহরাঞ্চলে কল-কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। প্রতিদিনই এই সংখ্যা বাড়ছে। এমন অবস্থায় পাচার ও নিখোঁজের সংখ্যা যে বাড়বে, তাতে আর আশ্চর্য কী! লক্ষ লক্ষ শিশু ও যুবক-যুবতী রাজ্যের বাইরে, এমন কি দেশের বাইরেও চলে যায় পেটের জ্বালায়। এ চিত্র দুঃখের, বেদনার, চোখের জলের। যারা চলে যায় তাদের মধ্যেও থাকে হাজার হাজার শিশুশ্রমিক। অদক্ষ মজুর হিসাবে তারা খাটে। ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভের ১০ জুন প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে, ২০০৭-এর জুলাই থেকে ২০০৮-এর জুন — মাত্র এক বছরে এই রাজ্য থেকে বাইরে মাইগ্র্যান্ট লেবার হিসাবে খাটতে গিয়েছে ১৩ লক্ষ ১২ হাজার ৩০০ জন। এদেরও বেশিরভাগই খাটে অদক্ষ মজুর হিসাবে। কেরালা থেকে ২৩.৯ লাখ, বিহার থেকে ৪৮.১ লাখ এইভাবেই পাড়ি দেয় দেশ-দেশান্তরে। এমনই ছিন্নমূল মজুরদের ২৯ জন দিল্লির আবাসস্থল ভেঙে পড়ায় মারা গেছে (দি টেলিগ্রাফ, ১৮ নভেম্বর, ২০১০)। এইভাবেই লক্ষ লক্ষ শিশু-কিশোর-কিশোরীদের জীবনে অপুষ্টি দূরীকরণ ও তাদের শিক্ষার সাংবিধানিক অধিকার নিতান্তই প্রহসনে পর্যবসিত হয়। বলা বাহুল্য, বহু ক্ষেত্রেই এই নানা বয়সী মজুরদের পাঠানো হয় কনট্রাক্টরদের তদারকিতেই।

পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী এই ভারতে রঙিন শিশু-কল্যাণ প্রকল্পের ঘোষণা এবং শিশু শ্রমিক নিয়োগ যতই বে-আইনি ঘোষণা করা হোক না কেন, শিশুদের প্রতি ভালবাসা ও দায়িত্ববোধের যত বিজ্ঞাপনই দিক না কেন, শিশুরক্ত পান না করে এই কলঙ্কিত পুঁজিবাদী সভ্যতার তথাকথিত 'উন্নয়ন' হবে না। পুঁজিবাদের উদ্ভবের সময় ৭ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুশ্রমিকদের সম্পর্কে মার্কস বলেছেন — ''খাটুনির আধিক্যে নাকাল করে তাদের টেনে আনা হয় মরণের সীমানায়... জনসাধারণের চোখের আড়ালে ডার্বিশায়ার, নটিংহামশায়ার ও ল্যাঙ্কাশায়ারের সুদৃশ্য রোমান্টিক উপত্যকাগুলি হয়ে দাঁড়াল নির্যাতনের এবং বহু হত্যার বিষণ্ণ বিজনভূমি। ... পুঁজিবাদী উৎপাদন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের জনমত থেকে লজ্জাবোধ ও বিবেকের লেশটুকুও খসে পড়ে। পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের কাজে লাগে এমন প্রতিটি কুকীর্তি নিয়েই বেহায়ার মতো বড়াই করত জাতিগুলি। ... জন্মপত্র ছাড়াই যুক্তরাষ্ট্রে যে পুঁজির অভ্যুদয় ঘটেছে, তার অনেকখানিই ছিল গতকালের ইংল্যান্ডের মূলধনীকৃত শিশুরক্ত'' (পুঁজির উদ্ভব)।

পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ শিশুরক্তে রঞ্জিত জন্মচিহ্ন আজও বহন করে চলেছে। বহন করে চলেছে শিশু শ্রমিকের রক্তপানের চিরায়ত মজ্জাগত ব্যাধি। এই পিষ্ট ও পাচার হওয়া শিশুর সংখ্যা বাড়ে, তারা হারিয়ে যায় চিরদিনের জন্য। শোষণের জাঁতাকলে নিখোঁজ হয়ে যায় তাদের শৈশব। এই গভীর ষড়যন্ত্র পরিচালিত হচ্ছে জাতির ভবিষ্যতকেই ধ্বংস করতে। সেই ষড়যন্ত্র আড়াল করতে শিশুপ্রেমের এমন ঢক্কানিনাদ। রাষ্ট্রনায়কদের ও সেলিব্রিটিদের — বারবণিতাদের শিশুদের সঙ্গে, এইডস আক্রান্ত শিশুদের সঙ্গে গলা জড়াজড়ির নাটকীয় জঘন্য প্রতারণা। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ আজ আর শিশুদের বাসভূমি হিসাবে কোনও দেশকেই রক্ষা করেনি। ভারতবর্ষকেও না। সে কারণে শিশুদের শৈশবকে, শিশুদের ভবিষ্যতকে রক্ষা করতে হলে, এ দেশকে শিশুদের বাসভূমি হিসাবে গড়ে তুলতে হলে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে না লড়ে উপায় নেই।

পুলিশের গুলিতে বাংলাদেশে শ্রমিক হত্যা, কারখানায় আগুন

গুলি চালনার নিন্দা করে কলকাতায় ডেপুটি হাইকমিশনারের অফিসে শ্রমিকদের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ

বাংলাদেশে অত্যন্ত কম বেতনে কর্মরত পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের উপর গত কয়েক মাস যাবৎ সরকার ও মালিকের যে অবর্ণনীয় অত্যাচার চলছে এবং গত ১২ ডিসেম্বর ঢাকা ও চট্টগ্রামে আন্দোলনরত কর্মীদের উপর পুলিশের নির্বিচারে গুলিচালনা ও ৩ জন শ্রমিককে হত্যা ও ১৪ ডিসেম্বর পোশাক কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ২৫ জন শ্রমিকের মৃত্যুর প্রতিবাদে ১৫ ডিসেম্বর এ আই ইউ টি ইউ সি-র সর্বভারতীয় কমিটির উদ্যোগে কলকাতায় এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়। শ্রমিকদের এক মিছিল সংগঠনের সদর দপ্তর থেকে পার্কসার্কাসে অবস্থিত বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার অফিস অভিমুখে যায় এবং সেখানে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতেই পুলিশের গুলিচালনায় নিহত এবং ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃত শ্রমিকদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। ভারতীয় শ্রমিকদের পক্ষ থেকে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড শংকর সাহার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে লিখিত এক স্মারকলিপি বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনের প্রতিনিধির হাতে তুলে দেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন কমরেড এ কে মজুমদার, এ এল গুপ্ত, অচিন্ত্য সিনহা, দিলীপ ভট্টাচার্য প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

(বাঁদিকে) মিছিলের একাংশ। (ডানদিকে) মিছিলের সামনে নেতৃবৃন্দ।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্দেশে এ আই ইউ টি ইউ সি-র স্মারকলিপি

''আপনার দেশের পোশাক শিল্পে নিযুক্ত ৩০ লক্ষ শ্রমিক কর্মচারীর অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা ও অব্যাহত সীমাহীন বঞ্চনায় ভারতের শ্রমজীবী জনগণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ। তাদের মাসিক ৫০০০ টাকা (৭০ ডলার) বেতনের দাবি আপনার সরকার বহু আগেই অগ্রাহ্য করেছে। সরকার নিযুক্ত 'ন্যূনতম বেতন বোর্ড' কর্তৃক গত জুলাই মাসে ঘোষিত ৩০০০ টাকা বেতন কার্যকর করা তো দূরের কথা, ২০০৬ সালে ঘোষিত মাসিক মাত্র ১৬৬২ টাকা বেতন থেকেও এই শ্রমিকরা বঞ্চিত। পরিণতিতে সীমাহীন দারিদ্র্য, অপুষ্টি, অনাহার ও মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের অভাবের সাথে সাথে কাজের পরিবেশের অসহনীয় অবস্থা সপরিবারে তাদের জীবনকে আজ দুর্বিষহ করে তুলেছে। মাত্রা ছাড়িয়েছে মহিলা শ্রমিকদের উপর বহুবিধ অত্যাচার।

অন্যদিকে, আই এল ও কনভেনশন স্বীকৃত সংগঠিত হওয়ার অধিকার সহ বিভিন্ন অধিকার দীর্ঘদিন ধরেই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার। সংবাদে প্রকাশ, বিগত কয়েক মাসে নেতৃবৃন্দ সহ প্রায় ৩০ হাজার শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই পুলিশি হেফাজতে বহু শ্রমিক নিহত এবং আরও বহু শ্রমিকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা রুজু করা হয়েছে। সরকারের এই ভূমিকা মালিকদের যেমন আরও উদ্ধত ও বেপরোয়া করে তুলেছে, তেমনি শ্রমজীবী মানুষের মধ্যেও প্রচণ্ড ক্ষোভ ও অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে। সর্বশেষ, গত ১২ ডিসেম্বর, রাজধানী ঢাকা ও বন্দর শহর চট্টগ্রামে আন্দোলনরত শ্রমিকদের উপর পুলিশ নির্বিচারে লাঠি-গুলি-কাঁদানে গ্যাস চালিয়ে যেভাবে ৩ জন শ্রমিককে হত্যা ও অসংখ্য শ্রমিককে গুরুতর আহত করেছে তাতে বহুমুখী আক্রমণে জর্জরিত ভারতের শ্রমজীবী জনমানসেও গভীর উদ্বেগ ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। এই সীমাহীন বর্বরতা ও নৃশংসতাকে ধিক্কার জানানোর ভাষা আমাদের জানা নেই।

আপনি জানেন, কর্মস্থলে উপযুক্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা না থাকার ফলে বারে বারেই দুর্ঘটনা ঘটছে। গত ১৪ ডিসেম্বর ঢাকার আশুলিয়ার এক কারখানায় এমনই এক দুর্ঘটনায় (অগ্নিকাণ্ডে) বহু শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছেন, হাজার হাজার শ্রমিক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন। এই ঘটনা আবার প্রমাণ করল, বাংলাদেশে মালিকদের স্বর্গরাজ্যে শ্রমিকদের জীবন কত মূল্যহীন এবং কী নিদারুণ নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে তাদের কাজ করতে বাধ্য করা হয়। দলে দলে শ্রমিকের জীবন যায়, কিন্তু মালিকের গায়ে আঁচড় লাগে না। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি সত্যই ভয়াবহ ও অগ্নিগর্ভ।

এই পরিস্থিতিতে কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ও শ্রমিকস্বার্থের প্রতি দায়বদ্ধ কোনও সংগঠন উদ্বিগ্ন না হয়ে পারে না। স্বাভাবিক কারণেই ন্যায়সঙ্গত দাবিতে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের এই আন্দোলনের প্রতি ভারতের শ্রমজীবী জনগণের সাথে অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার (এ আই ইউ টি ইউ সি) সমর্থন, সংহতি ও সহমর্মিতা জ্ঞাপন করছে এবং কলকাতায় বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনারের অফিসের সামনে আয়োজিত বিশাল বিক্ষোভ-সমাবেশের পক্ষ থেকে আপনার উদ্দেশে এই স্মারকলিপি প্রেরণ করছে।

এই সমাবেশ পুলিশি আক্রমণের নিরপেক্ষ তদন্ত, দোষীদের শাস্তি, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, নেতৃবৃন্দ সহ সমস্ত আটক শ্রমিকের নিঃশর্ত মুক্তি, সাম্প্রতিক দুর্ঘটনায় ও পুলিশি আক্রমণে নিহত ও আহতদের পরিবারবর্গকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, আহতদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা, কর্মস্থলে উপযুক্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং শ্রমিকদের মজুরিবৃদ্ধি সহ অন্যান্য ন্যায়সঙ্গত দাবি মেনে নেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছে। আমরা এও দাবি করছি, আপনার সরকার অবিলম্বে ঘোষণা করুক — 'ন্যায়সঙ্গত শ্রমিক আন্দোলনে পুলিশ হস্তক্ষেপ করবে না''।

সংসদ বয়কটের মতো শক্তিশালী হাতিয়ারের খুশিমতো ব্যবহার উচিত নয়

একের পাতার পর

কিছু কোম্পানিকে টু-জি লাইসেন্স দিয়েছেন। কিন্তু কংগ্রেস সরকার তাতে কর্ণপাত করেনি। শেষ পর্যন্ত ক্যাগ রিপোর্ট বেরোনোর পর প্রকাশ পায় যে বেছে বেছে এবং কম দামে লাইসেন্স বিলির মধ্য দিয়ে রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ ১ লক্ষ ৭৬ হাজার কোটি টাকা। এর পরও কিন্তু কংগ্রেস সরকার কোনও সুনির্দিষ্ট অবস্থান নেয়নি। শেষ পর্যন্ত কিছুতেই সত্য আড়াল করা যাবে না বুঝে তারা রাজাকে পদত্যাগ করতে বলে।

শুধু টু-জি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারি নয়, মন্ত্রী-আমলা-মিলিটারি ও বিচারপতিদের জড়িয়ে বেশ কিছু দুর্নীতির অভিযোগ সম্প্রতি সামনে এসেছে। আবার এ কথাও ঠিক নয় যে, দুর্নীতি আজকেই কেবল ঘটছে। সেই পঞ্চাশের দশক থেকে আজ পর্যন্ত যে দলই সরকার গড়ে থাকুক না কেন, কংগ্রেস-বিজেপি-জনতা পার্টি, সিপিআই-সিপিএম সব দলের শাসনেই নেতা-মন্ত্রী-আমলাদের জড়িয়ে বড় বড় দুর্নীতি ফাঁস হয়েছে। বোফর্স কেলেঙ্কারি থেকে হর্ষদ মেহেতার শেয়ারমার্কেট জালিয়াতি, এক সময়ের বিজেপি সভাপতি বঙ্গারু লক্ষ্মণের দুর্নীতি, কারগিল কফিন কেলেঙ্কারি, লালুপ্রসাদ যাদবের গোখাদ্য কেলেঙ্কারি, তেলগির ভুয়া স্ট্যাম্প কেলেঙ্কারি, এম পি ল্যাডের টাকা চুরি, ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের টাকা আত্মসাৎ ইত্যাদি ভুরি ভুরি দুর্নীতির ঘটনায় ভারত ইতিমধ্যেই যথেষ্ট কলঙ্কিত।

একটা প্রাথমিক হিসাবেই বোঝা যায়, এ দেশে আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে পুলিশ-প্রশাসনের চোখের সামনেই ব্যবসার নামে অপরাধের কারবারে প্রতিদিন হাজার হাজার কোটি টাকা বেআইনি লেনদেন ঘটে যাচ্ছে। বাড়ির ব্যবসা, অস্ত্র থেকে ড্রাগের ব্যবসা— সর্বত্রই দুর্নীতির ছড়াছড়ি। এ সব ঘটনার মাথায় যারা বসে আছে, তারা জানে, কোথায় কাকে টাকা দিয়ে বশে আনতে হয়। এদের অস্তিত্বই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। এ ভাবেই এ দেশের শাসক শ্রেণী ক্ষমতালোলুপ রাজনৈতিক দলগুলিতে দুর্নীতিবাজদের অবাধ প্রবেশাধিকার দিয়েছে। এখানে নির্বাচনকে নিয়ন্ত্রণ করে অর্থবল, কে কোন মন্ত্রীর দপ্তর পাবে তাও ঠিক হয় অর্থের জোরে, সরকারি নীতিও নির্ধারিত হয় অর্থ লেনদেনের মাপকাঠিতে। এ ভাবেই শাসক পুঁজিপতি শ্রেণী গোটা দেশ ও সমাজকে দুর্নীতির বিষে সম্পূর্ণ পচিয়ে দিতে এক বিরাট জাল ছড়িয়েছে। চূড়ান্ত শোষণ সর্বোচ্চ মুনাফার যেমন ব্যবস্থা করে দিচ্ছে, একই সঙ্গে সর্বোচ্চ দুর্নীতিরও জন্ম দিচ্ছে। যে টাটা সিঙ্গুরে চাষিদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া জমিতে তাকে কারখানা করতে দেওয়া হল না বলে, সিপিএমের সঙ্গে তার গোপন বন্দোবস্ত চাষি আন্দোলনের জেরে ভেস্তে গেল বলে ক্ষিপ্ত হয়ে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিতে দ্বিধা করেন না, 'দেশের কল্যাণে তাঁর একটি শিল্প প্রকল্প কীভাবে রাজনীতির কোপে আটকে গেল' তা নিয়ে আক্ষেপ করে ভান করেন যেন তিনি দেশের কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ একজন শিল্পপতি, তিনিই আবার টেলিফোনের বিশেষ লাইসেন্স পাওয়ার জন্য বিশেষ ব্যক্তিকে মন্ত্রীত্ব পাইয়ে দিতে গোপনে বিভিন্ন সোর্স ব্যবহার করতেও পিছুপা হন না। এভাবেই শিল্প-ব্যবসা ও দুর্নীতি হাত ধরাধরি করে চলছে।

ফলে এ কথা দিবালোকের মতো পরিষ্কার যে, ঢালাও দুর্নীতি বাস্তবে আমাদের দেশের সংকট জর্জরিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এক কথায় তা আজকের যুগের ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের মজ্জাগত বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। সুতরাং পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ না করে এই দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ ঘটানো যাবে না। সমাজের যে বনিয়াদ অসাম্যের জন্ম দিচ্ছে, সাধারণ মানুষের জীবনে ক্রমবর্ধমান ও তীব্র অভাব-অভিযোগ ডেকে আনছে, অন্যায় পথে একদলকে সবকিছু দখল করার সুযোগ করে দিচ্ছে, আর ন্যায়ের পথে থাকা অধিকাংশ মানুষের জুটছে শুধু বঞ্চনা-অভাব-অনটন, একমাত্র সেই বনিয়াদ বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে উৎপাটিত করলেই সমাজ দুর্নীতির অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। যেটা এই পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র করে দেখিয়েছিল। সমাজতন্ত্রের অতি বড় শত্রুও জানে সোভিয়েট ইউনিয়ন, চীন ও ভিয়েতনাম যতদিন সমাজতন্ত্রের পথে ছিল, সংশোধনবাদীরা তাকে কলুষিত করতে পারেনি, ততদিন সেখানে দুর্নীতি একটা অতীতের বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। পুঁজিবাদ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা যে আর্থিক-সামাজিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা সমাজতন্ত্র নিয়ে এসেছিল তা মানুষের জীবনের সমস্ত প্রাথমিক প্রয়োজনগুলিকে মিটিয়েছিল এবং সমাজতন্ত্রের অগ্রযাত্রার পরিপূরক যে সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল, তা ব্যক্তিস্বার্থ পূরণের জন্য অন্যায় পথে কিছু অর্জনের প্রতি মানুষের মধ্যে ঘৃণার মনোভাব সৃষ্টি করেছিল। যতদিন পর্যন্ত এই দেশগুলি সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছে ততদিন তা সমাজের মধ্যে ঐ ধরনের মানসিকতারই জন্ম দিয়েছে। কিন্তু সংশোধনবাদী নেতারা যেদিন ঐ পথ পরিত্যাগ করলেন এবং পুঁজিবাদকে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন সেদিন থেকেই আবার পুঁজিবাদী কলুষ ফিরে এল সেখানেও।

কিন্তু এ কথার মানে এ নয় যে, বিপ্লবের আঘাতে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করার আগে পর্যন্ত এই দুর্নীতিকে ঠেকাবার কোনও রাস্তা নেই। চুরি-দুর্নীতি-জালিয়াতির বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিষেধক হচ্ছে, জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে সমাজের একেবারে নিচুতলা থেকে ওপর পর্যন্ত জনগণের সচেতন সংগঠিত দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন এবং অবশ্যই যা গড়ে তুলতে হবে উন্নত রুচি-সংস্কৃতির আধারে। এই দিকটাকেই জোর দিয়ে আমরা বারবার বলতে চেয়েছি যে, শুধুমাত্র সংসদীয় আন্দোলনের দ্বারা কোনও ফল হবে না এবং তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। দরকার হচ্ছে, সংসদের বাইরে তীব্র সংগ্রাম গড়ে তুলে তার সাথে সংসদীয় সংগ্রামকে যুক্ত করা। অর্থাৎ জনগণের ন্যায্য দাবি-দাওয়ার সামান্য কিছুও যদি আদায় করতে হয়, তবে সংসদবহির্ভূত সংগ্রামের উপরই জোর দিতে হবে বেশি। একটা গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুধু কিছু দাবি আদায়ের মধ্য দিয়েই শেষ হয়ে যায় না, আন্দোলনের প্রক্রিয়ায় তা নতুন চিন্তা, নতুন মূল্যবোধ নিয়ে আসে। এক কথায়, এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে, যা প্রশাসনিক ও কর্পোরেট দুর্নীতির বেপরোয়া চালচলনের বিরুদ্ধে একটা প্রতিষেধক রূপে কাজ করতে পারে। ভারতের গত আশি বছরের ইতিহাসও তার প্রমাণ দেবে।

এ কথা ঠিক যে, একটা বিশ্বশক্তি হিসাবে পুঁজিবাদ যখন ক্ষয়িষ্ণু ও প্রতিক্রিয়াশীলে পরিণত হয়েছে, ভারতের পুঁজিবাদ সেই সময়েই গড়ে উঠেছে। ফলে আনুষঙ্গিক সমস্ত রকম পাপাচার সমাজের সমস্ত স্তরে ও সরকারি প্রশাসনেও তখন থেকেই দেখা দিয়েছে। ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে পরাধীন ভারতে সীমিত ক্ষমতা নিয়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের বিভিন্ন সরকার গঠিত হয়েছিল। ঐ সময়েও সরকারি পদের অপব্যবহার করে সম্পত্তি বানাবার, ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার নানা ঘটনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের তেজ এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, এইসব ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করা ব্যক্তিরাও বেপরোয়া দুর্নীতিতে মাততে পারেনি, তাদের মনে জনরোষের ভয় ছিল। এমনকী আপসের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারতের জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি হিসাবে কংগ্রেস ক্ষমতায় বসার পরও সুযোগসন্ধানীদের কিছুটা নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় থাকতে হয়েছিল। কারণ তখনও সমাজে গৌরবময় স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপক প্রভাব ছিল। কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে যখন ঐ প্রভাব কমতে থাকল, পুঁজিবাদী শাসন ক্রমেই সংহত হল, স্বাধীন ভারতে দুর্নীতি ক্রমে ক্রমে তার কালো মাথা তুলল। ১৯৫০ এবং '৬০-এর দশকে ডালমিয়ার এল আই সি কেলেঙ্কারি, মুন্দ্রা কেলেঙ্কারি, নাগরওয়ালা জালিয়াতি ইত্যাদি সামনে আসে। তবুও তখন পর্যন্ত কিছুটা হলেও গণআন্দোলনের চাপ ছিল এবং সে কারণে মুন্দ্রা বা ডালমিয়া যে-ই হোক, তাদের শাস্তি পেতে হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালার মতো রাজ্যকে ধরলে দেখা যাবে, সেখানে বামগণতান্ত্রিক আন্দোলন শক্তিশালী ছিল বলে দুর্নীতি ব্যাপকভাবে মাথা তুলতে পারেনি। কারণ জনসাধারণ আপেক্ষিক অর্থে সচেতন ও সতর্ক ছিল।

দেশের এই অবস্থার অবনতি শুরু হয় যখন সিপিএম-সিপিআইয়ের মতো স্বঘোষিত মার্কসবাদীরা তাদের সোস্যাল ডেমোক্রেটিক আপসমুখী চরিত্র অনুযায়ী গণআন্দোলনের পথ পরিত্যাগ করে এবং ১৯৭০-এর শেষ ভাগ থেকে বামগণতান্ত্রিক আন্দোলনের ভিতরে থেকেই শাসক শ্রেণীর আশীর্বাদ পেয়ে সরকারি ক্ষমতায় যাওয়ার লোভে তার মেরুদণ্ডকে ধীরে ধীরে ক্ষইয়ে দিতে শুরু করে। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েই শাসক পুঁজিপতি শ্রেণীর মদতে গোটা দেশে নানা পৃথকতাবাদী শক্তি মাথা তুলতে শুরু করে। মেহনতি জনগণের ঐক্যে তারা ফাটল ধরায়। সাম্প্রদায়িক, জাতপাতমূলক বা নানা সংকীর্ণ প্রাদেশিকতাবাদী মনোভাব ইত্যাদিকে মদত দিয়ে জনগণের এক অংশের মধ্যে অপর অংশ সম্পর্কে অবিশ্বাস, সন্দেহের জন্ম দেওয়া হয়। এর ফলে পুঁজিবাদী শোষণ থেকে উদ্ভূত নিপীড়িত জনগণের যে ক্রোধ শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে পরিচালিত হওয়ার কথা ছিল তা বিপথে চালিত হয়ে যায়। স্বভাবতই জনগণের মধ্যে আকাঙ্খিত রাজনৈতিক চেতনা গড়ে ওঠাও বাধা পায়। পরিণামে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে গুরুতর বিপর্যয় ঘটে যায়। গণআন্দোলনের চাপ সরে যাওয়ার ফলে কায়েমি স্বার্থবাদীদের দ্বারা ইচ্ছামতো দুর্নীতি করার রাস্তা পুরোপুরি খুলে যায়। যে কোনও ধূর্ত ব্যক্তির পক্ষে চুরি-দুর্নীতি-জালিয়াতি করাটা অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়। একের পর এক বিপুল পরিমাণ টাকার চুরি-দুর্নীতি বিনা বাধায় ঘটতেই থাকে। তথাকথিত রানিয়ন্ত্রিত বাজার অর্থনীতির সময়েও দুর্নীতি অবাধে ঘটেছে, এখন মুক্ত বাজার অর্থনীতিতেও অবাধে ঘটছে। অনেকে বলছেন, তথাকথিত মুক্ত বাজার অর্থনীতি নাকি আগের তুলনায় দুর্নীতি বাড়িয়ে দিয়েছে। তাঁদের মতে আগেও দুর্নীতি ছিল, তবে সেটা বর্তমানের মতো এত ব্যাপক নয়। আগে দুর্নীতি কতটা ছিল, আর এখন দুর্নীতি কতটা, তা নিয়ে তুল্যমূল্য বিচার অর্থহীন। এর দ্বারা দুর্নীতি রূপ দুষ্ট ক্ষতটিকে নানা কথার আড়ালে লঘু করা হয় এবং এর উৎস যে জড়িয়ে আছে এই শোষণমূলক ব্যবস্থার সঙ্গে তা পরিষ্কার চিনে নেওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করা হয়।

যাই হোক, ব্যাপক দুর্নীতির এই পরিস্থিতিতে গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করাটাই যেখানে দায়িত্ব ছিল, সেখানে দেখা গেল, স্বঘোষিত বামপন্থী-মার্কসবাদীরা সহ সমস্ত সংসদীয় বিরোধীপক্ষ জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির দাবিতে লোকসভা অচল করে দিলেন। একটা ধারণা সৃষ্টি করতে চাওয়া হচ্ছে যেন, একমাত্র জেপিসি-ই সম্পূর্ণ সত্য উদ্‌ঘাটন করতে পারে। এ কথা আদৌ ঠিক নয়। বিস্তারিত ঘটনায় না গিয়েও বলা যায়, এ পর্যন্ত সংসদে চারটি ঘটনায় জে পি সি হয়েছে। ১৯৮৭ সালে বোফর্স চুক্তি, ১৯৯২ সালে হর্ষদ মেহেতা কেলেঙ্কারি, ২০০১ সালে শেয়ার মার্কেট কেলেঙ্কারি, ২০০৩ সালে ঠাণ্ডা পানীয়ে কীটনাশক মেশানোর পরিমাণ নিয়ে জেপিসি গঠন করা হয়েছিল। কোনও একটিতেও তদন্ত রিপোর্ট গ্রহণ করা হয়নি, কারও শাস্তিও হয়নি। এই অভিজ্ঞতা কী বলে? জেপিসি করলেই সত্য বেরিয়ে আসবে? দোষীরা শাস্তি পাবে? তা ছাড়া জেপিসি-র সদস্য হবেন কারা? শাসক দলই ঠিক করে কারা সদস্য হবেন এবং স্বভাবতই শাসক দলের সদস্যরাই বেশি করে সদস্য হন। বিরোধীদের মধ্য থেকে শাসক দল তেমন লোককেই বেছে নেয় যাদের কেনা যায়। এ হেন তদন্ত কমিটি থেকে ন্যায় বিচার আশা করা বাতুলতা।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, যে সমস্ত বিরোধী দল জেপিসির দাবি নিয়ে আজ শোরগোল করছেন, তাঁরা নিজেরা কি দুর্নীতিমুক্ত? ইতিপূর্বেই বিজেপি ও অন্যান্য দলের কিছু কেলেঙ্কারির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। এও বেরিয়ে পড়েছে যে, কংগ্রেসের সুখরাম থেকে বিজেপি সরকারের আমলে টেলিকম মন্ত্রী প্রমোদ মহাজনের আমলেও টেলিকম জালিয়াতি ভালোই ঘটেছে। কর্নাটকে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী ইয়েদুরাপ্পাকে নিয়ে সদ্যই বিরাট কেলেঙ্কারির ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে। লালুপ্রসাদ, মুলায়ম সিং, মায়াবতী, জয়ললিতা কেউ বাদ নেই। স্বঘোষিত মার্কসবাদী সিপিএম-সিপিআইয়ের শাসন সম্পর্কে পশ্চিমবাংলার মানুষের অভিজ্ঞতা ভালোই আছে এবং তারা জানে এই দলগুলোর উপর থেকে তলা পর্যন্ত দুর্নীতির পাঁকে ডুবে রয়েছে। কেরালায় সিপিএম শাসনে লাভলিন ও লটারি কেলেঙ্কারির কথা অজানা নেই। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমের মদতে প্রোমোটাররাজ, সরকারি জমির বেআইনি হাতবিনিময়, বিপিএল কার্ড নিয়ে দুর্নীতি, রেশন নিয়ে দুর্নীতি, সরকারি চাকরিতে নিয়োগ, শিক্ষক পদে নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতি ইত্যাদি আজ এতটাই নগ্ন যে, তা সিপিএম দলকে মানুষ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। এ কথাও প্রকাশ পেয়েছে যে, সিঙ্গুরে জমি নেওয়ার ব্যাপারে টাটা ও সিপিএমের মধ্যে মধ্যস্থতার কাজ করেছেন কুখ্যাত নীরা রাডিয়া। যার পুরস্কারস্বরূপ নীরা রাডিয়ার কোম্পানিকে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পনিগম ও ওয়েবেল সংস্থার জনসংযোগকারী সংস্থা (পি আর এজেন্সি) হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। সবই লেনদেনের ব্যাপার।

সুতরাং দুর্নীতির বিরুদ্ধে এইসব দলগুলোর কিছু বলার নৈতিক অধিকারই নেই। আসলে কংগ্রেস যখন ক্ষমতায় থাকে, বিজেপি অথবা সিপিএম তখন তার দুর্নীতি নিয়ে বলে। আবার বিজেপি বা সিপিএম যখন ক্ষমতায় থাকে তখন কংগ্রেস তার দুর্নীতি নিয়ে বলে। সবটাই নকল লড়াই। ফলে যে কোনও সচেতন মানুষের বুঝতে অসুবিধা হবে না, জেপিসির দাবি নিয়ে বিজেপি-সিপিএম-সিপিআইয়ের পার্লামেন্ট বয়কটের পিছনে ভোটবাক্সের রাজনীতি ছাড়া আর কিছু নেই। আজ যদি বিজেপি কেন্দ্রীয় সরকারে থাকত তবে তার বিরুদ্ধে কংগ্রেস গলা ফাটাত। যেমন কর্নাটকে ইয়েদুরাপ্পার সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কংগ্রেস বলছে। সুতরাং জেপিসির দাবি যদি মেনে নেওয়াও হয়, তবু তার দ্বারা কাজের কাজ কিছু হবে বলে মনে হয় না। বিশেষ করে যখন এই দাবির পিছনে পার্লামেন্টের বাইরে গণআন্দোলনের কোনও ভূমিকা নেই। বস্তুত, এত বড় বিশাল মাপের জন্য দুর্নীতির বিরুদ্ধে দেশজোড়া যে ঢেউ ওঠা উচিত ছিল, ইতিমধ্যেই এই সমস্ত দলগুলোর ক্রিয়াকলাপে

সাতের পাতায় দেখুন

দিনহাটা কলেজে এ আই ডি এস ও-র সম্মেলন

১৬ ডিসেম্বর কোচবিহারের দিনহাটা নৃপেন্দ্র নারায়ণ স্মৃতি পাঠাগারে ১৫০ জন ছাত্রের উপস্থিতিতে এ আই ডি এস ও-র দিনহাটা কলেজ ইউনিট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দিনহাটায় আরও একটি কলেজ স্থাপন, শূন্যপদে অধ্যাপক নিয়োগ, এস এফ আইয়ের সন্ত্রাস বন্ধ প্রভৃতি দাবিতে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন থেকে নির্মল কুমার রায়কে সভাপতি ও সত্যম বর্মণকে সম্পাদক করে ২৯ জনের কমিটি গঠিত হয়।

পুরুলিয়া

একের পাতার পর

পদপিষ্ট হতে হতে অন্যদের তৎপরতায় কোনও ক্রমে বেঁচে গেল। বেশ কয়েকজন ব্যক্তি আহত হলেন। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করা গেল না। এত স্পর্ধা পুলিশ প্রশাসনের সহ্য হল না। তারা প্রথমে শূন্যে তিন রাউন্ড গুলি ছুড়ল। তারপর আরও পুলিশ নিয়ে এসে দফায় দফায় নির্দয়ভাবে লাঠি চালাল, সঙ্গে অশ্রাব্য গালিগালাজ। তাদের লাঠি চালানোর উদ্দেশ্য জনতাকে সরিয়ে দেওয়া নয়, মারাত্মকভাবে জখম করে আন্দোলনকারীদের মনোবল ভেঙে দেওয়া। লাঠির আঘাতে গুরুতর জখম হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন ১৩ জন। আহত হলেন শতাধিক। উন্মত্ত পুলিশ তখন যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই নির্মমভাবে মারছে আর গ্রেফতার করছে। তাদের এই আক্রমণের হাত থেকে সাধারণ পথচারীরাও নিস্তার পাননি। তারপরেও পুলিশ এস ইউ সি আই (সি)-র কর্মীদের ধরবার জন্য কয়েক ঘণ্টা তল্লাশি চালিয়েছে। পুরুলিয়া শহরের মানুষ এই পুলিশি নৃশংসতার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন।

পুলিশ, দলের ১১ জন বিশিষ্ট নেতা-কর্মীকে আটক করে তাদের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা সহ জামিন অযোগ্য বহু ধারায় মিথ্যা মামলা সাজিয়েছে। এছাড়াও জেলা সম্পাদিকা কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য সহ ১০ জনের নামে মিথ্যা অভিযোগে এফ আই আর দায়ের করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন জেলার প্রবীণ সংগঠক কমরেড শৈলেন বাউরী, দলের জেলা কমিটির সদস্য ও ছাত্র সংগঠক কমরেড সৌরভ ঘোষ, জামুরিয়া লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড জিতেন মাজি, পুরুলিয়া মফঃস্বল লোকাল কমিটির সম্পাদিকা কমরেড সুস্মিতা মাহাত, পরিচারিকা সমিতির জেলা সম্পাদিকা কমরেড শোভা মাহাত, ডি এস ও-র জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সোনামণি মাহাত প্রমুখ।

সিপিএম সরকারের এই পুলিশি বর্বরতার প্রতিবাদে ও ধৃতদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে ১৪ ডিসেম্বর জেলার সর্বত্র পথসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন স্থানে পথ অবরোধ করা হয়। নেতৃত্বের পক্ষ থেকে দাবিগুলি নিয়ে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

দুর্নীতি রোধে সংসদের বাইরের গণআন্দোলন শক্তিশালী করুন

ছয়ের পাতার পর

তা অনেকটাই মার খেয়ে গেছে। প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ একটা বিশাল মাপের আন্দোলনের রূপ নিতে পারত, তা কার্যত একটা ধাপ্পায় পরিণত হয়েছে

প্রসঙ্গত এ কথাও বলা দরকার যে, সংসদ বয়কট গণআন্দোলনেরই একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। অথচ সেই গণআন্দোলনকে বাদ দিয়ে যেভাবে বিজেপি-সিপিএম-সিপিআই প্রমুখ দলগুলো দীর্ঘ সময় ধরে সংসদ বয়কট করে যাচ্ছে, তাতে এই শক্তিশালী হাতিয়ারটিকে ভোঁতা করে দেওয়া হচ্ছে বলে আমরা মনে করি। এর ফলে সরকার জনগণকে বিভ্রান্ত করবার জন্য প্রচার করার সুযোগ পাচ্ছে যে, সংসদের অধিবেশন অচল করে দেওয়ার দ্বারা কী বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি করা হচ্ছে। এর দ্বারা ইচ্ছামতো অর্ডিন্যান্স জারি করার স্বৈরাচারী পন্থাকেও ন্যায্য বলে দেখাবার অজুহাত সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। সুতরাং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যে কোনও হাতিয়ারের মতো সংসদ বয়কটের মতো শক্তিশালী হাতিয়ারকেও গভীর বিচার-বিবেচনা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত। অন্যথায় এই হাতিয়ারটিও তার শক্তি হারাবে, এমনকী সংসদ বয়কট করার গণতান্ত্রিক অধিকারটিও কেড়ে নেওয়ার সুযোগ তুলে দেওয়া হবে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হাতে। বস্তুত দেখা যাচ্ছে, সিপিএম-সিপিআইয়ের মতো মেকি মার্কসবাদীরা নিজেদের দুর্নীতিবিরোধী যোদ্ধা হিসাবে সংবাদমাধ্যমে তুলে ধরার জন্য কার্যত ঐ হাতিয়ারটিকেই ভোঁতা করে দিচ্ছে এবং সরকারের দুরভিসন্ধিমূলক পরিকল্পনা সফল করতেই সাহায্য করছে। আমরা আবারও বলতে চাই, সংসদ বয়কটের আন্দোলন একমাত্র তখনই সফল হতে পারে যদি তার পিছনে সংসদের বাইরে সঠিক বিপ্লবী নেতৃত্বে সংগঠিত শক্তিশালী গণআন্দোলনের জোর থাকে। এও লক্ষণীয়, যে সিপিএম নেতৃত্ব সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে চাষিদের ন্যায্য আন্দোলনকে দমন করতে চরম নিষ্ঠুর ও নৃশংস পথ নিয়েছে এবং নিজেরা বহুকাল গণআন্দোলনের পথ পরিত্যাগ করেছে, তারাই আজ নির্দ্বিধায় সাম্প্রদায়িক বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে টিভি ক্যামেরাকে সামনে রেখে পার্লামেন্ট বয়কটের নাটক করছে।

এই পরিস্থিতিতে চিন্তাশীল মানুষকে আমরা এই সত্য উপলব্ধি করতে আবেদন জানাব যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রকোপ আটকাবার একমাত্র রাস্তা হচ্ছে জনগণের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে যথার্থ বিপ্লবী নেতৃত্বে গণআন্দোলন। এখানেই একটি সত্যিকারের বিপ্লবী দলের গুরুত্ব। তাদের এ কথাও উপলব্ধি করা দরকার যে, ভোটবাজ দলগুলো দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের যে নাটক করছে, তার উদ্দেশ্য পুঁজিবাদকে আড়াল করাই। ফলে তাদের কর্তব্য হবে, একদিকে স্বঘোষিত বামপন্থী সিপিএম-সিপিআইয়ের মতো দলগুলিকে ধ্বংসাত্মক পথ থেকে সরে আসার জন্য তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করা, অন্যদিকে যথার্থ বিপ্লবী পার্টিকে শক্তিশালী করা এবং দেশের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলতে এগিয়ে আসা।

উত্তর ২৪ পরগণায় বিদ্যুৎ দপ্তর ঘেরাও গ্রাহকদের

অ্যাডিশনাল সিকিউরিটি বাতিল সহ ৭ দফা দাবিতে লাগাতার আন্দোলনে নেমেছে নববারাকপুর কৃষিজমি রক্ষা সংহতি মঞ্চ ও অল বেঙ্গল ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন। এই দাবিতে ২৭ নভেম্বর গ্রাহকরা নববারাকপুর বিদ্যুৎ দপ্তরে বিক্ষোভ ডেপুটেশন দেন। অতিরিক্ত সিকিউরিটির বিরুদ্ধে ২১১৮টি আপত্তিপত্র জমা দেয় অ্যাবেকা। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাস ও সাধারণ সম্পাদক অনুকূল ভদ্র সহ জেলার অন্যান্য গ্রাহক নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে আলোচনায় বন্টন কোম্পানির চেয়ারম্যান কিছু দাবি মেনে নেন।

কমরেড সুব্রত চৌধুরীর জীবনাবসান

দলের রাজ্য দপ্তরের সামনে কমরেড সুব্রত চৌধুরীর মরদেহে মাল্যদান করে বিপ্লবী শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পূর্বতন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ও কোচবিহার জেলার প্রাক্তন সম্পাদক কমরেড সুব্রত চৌধুরী ১৬ ডিসেম্বর মধ্যরাতে সল্টলেকের এ এম আর আই হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। পার্টির বিশেষ কংগ্রেসে যোগদানের জন্য কোচবিহার থেকে ২৩ নভেম্বর কলকাতায় এসেই তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রথমে তাঁকে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটাল ও পরে এ এম আর আই হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। ফুসফুসের গুরুতর রোগে আক্রান্ত কমরেড চৌধুরীর জীবনরক্ষার জন্য চিকিৎসকদের সমস্ত প্রয়াসই ব্যর্থ হয়ে যায়। ১৭ ডিসেম্বর তাঁর মরদেহ হাসপাতাল থেকে কলকাতার রাজ্য দপ্তরে নিয়ে আসা হয়। সেখানে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ, পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী, কমরেড রণজিৎ ধর, কমরেড অসিত ভট্টাচার্য। পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী অনুপস্থিত থাকায় তাঁর পক্ষে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান কমরেড শঙ্কর সাহা। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড ছায়া মুখার্জী, কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার, কমরেড গোপাল কুণ্ডু ও কমরেড শঙ্কর সাহা মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে শ্রদ্ধা জানান রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তপন রায়চৌধুরী, কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষে জেলা সম্পাদক কমরেড চিররঞ্জন চক্রবর্তী। রাজ্য কমিটির উপস্থিত সদস্যরাও মাল্যদান করেন। কোচবিহার জেলা কমিটির পক্ষে মাল্যদান করেন কমরেড মণি নন্দী। এ ছাড়াও কোচবিহারের কমরেড নেপাল মিত্র, কমরেড রীনা ঘোষ, কমরেড সান্তনা দত্ত এবং ডি এস ও-র কোচবিহার জেলা সম্পাদক কমরেড মৃণাল রায় শ্রদ্ধা জানান। গণফ্রন্টগুলির কেন্দ্র, রাজ্য ও জেলা কমিটির পক্ষ থেকে মাল্যদান করা হয়। কলকাতার জেলার বিভিন্ন পার্টি ইউনিট পুষ্পস্তবক শ্রদ্ধা জানিয়ে মাল্যদান করে।

এরপর সমবেত কমরেডদের 'কমরেড সুব্রত চৌধুরী লাল সেলাম' ধ্বনির মধ্য দিয়ে প্রয়াত কমরেডের মরদেহ নিয়ে কমরেডরা কোচবিহারের উদ্দেশে রওনা দেন। ১৮ ডিসেম্বর কোচবিহারে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।

রেশন দুর্নীতি ও সারের ফাটকাবাজির বিরুদ্ধে তমলুকে বিক্ষোভ

ন্যায্য মূল্যে সার-বীজ-কীটনাশক সরবরাহ, জেলার সর্বত্র সুষ্ঠু জলসেচ-জলনিকাশির ব্যবস্থা, সরকার নির্ধারিত দামে কেরোসিন ও রেশনদ্রব্য সরবরাহ, সচিত্র রেশনকার্ড প্রদান সহ কৃষক-খেতমজুরদের বিভিন্ন দাবিতে ১৬ ডিসেম্বর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার উপকৃষি অধিকর্তা ও খাদ্য নিয়ামকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায় সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটি। প্রায় তিন শতাধিক কৃষক-খেতমজুর সামিল হন। দুই দপ্তরেই পুলিশ বিক্ষোভকারীদের উপর আক্রমণ করে। উপ কৃষিঅধিকর্তার কাছে ৯ দফা ও খাদ্য নিয়ামকের কাছে ৪ দফা দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন, কমরেডস নন্দ পাত্র, মন্মথ দাস, গোষ্ঠ কুইল্যা, নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, উৎপল প্রধান, বিবেক রায়, মনোজ দাস এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ সদস্য ডাঃ সন্তোষ মাইতি।

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

৩৪নং জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের নামে অতিরিক্ত জমি দখলের প্রতিবাদে

উচ্ছেদবিরোধী আন্দোলনের নতুন অধ্যায়

উত্তর ২৪ পরগণার বারাসাত থেকে উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলা পর্যন্ত ৩৪নং জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। কিন্তু সড়কটি চার লেন করতে যে জমি দরকার, তার থেকে অনেক বাড়তি জমি দখলের চক্রান্ত চলছে। এটা সফল হলে রাস্তার দু'পাশ জুড়ে লক্ষাধিক মানুষ জমি-ঘর-বাড়ি-দোকানপাট জীবন-জীবিকা থেকে উচ্ছেদ হবেন। এরই প্রতিবাদে বারাসাত থেকে ডালখোলা প্রায় ৫০০ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে শুরু হয়েছে উচ্ছেদবিরোধী আন্দোলনের নতুন অধ্যায়। গড়ে উঠেছে আন্দোলনের অসংখ্য কমিটি। রাস্তাটি যে পাঁচ জেলার উপর দিয়ে তৈরি হচ্ছে সেইসব জেলায় 'কৃষিজমি-বাস্তু ও জীবন-জীবিকা রক্ষা কমিটি' গড়ে উঠেছে।

আন্দোলনকে আরও বেগবান করতে এবং রাস্তার দু'পাশ জুড়ে গড়ে ওঠা সংগ্রাম কমিটিগুলির আন্দোলনকে এক সূত্রে গেঁথে নিতে ৪ থেকে ৬ ডিসেম্বর বারাসাত থেকে ডালখোলা পর্যন্ত উচ্ছেদ বিরোধী প্রচার অভিযানের ডাক দেওয়া হয়। এই অভিযানে ডালখোলা থেকে অধ্যাপক মানস জানার নেতৃত্বে একটি সুসজ্জিত ট্যাবলো, অপর প্রান্ত বারাসাতের সন্তোষপুর থেকে আর একটি সুসজ্জিত প্রচার জাঠা বের হয়। উচ্ছেদবিরোধী এই দুটি প্রচার জাঠা ৪ ডিসেম্বর রওনা দিয়ে ৬ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদের বহরমপুর শহর অতিক্রম করে সাগরদিঘি ব্লকে মিলিত হয় এবং সেখানে ৩৪নং জাতীয় সড়ক লাগোয়া সড়ক নির্মাণ সংস্থা হিন্দুস্থান কনস্ট্রাকশন কোম্পানির প্রসাদপুর ক্যাম্প অফিসে স্থানীয় জনগণকে সাথে নিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। এরপর সেখদিঘি স্থাইস্কুল মাঠে হয় জনসভা। উচ্ছেদের আশঙ্কায় শঙ্কিত এবং এই অন্যায় রুখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কয়েক হাজার মানুষ সমবেত হন। সারা বাংলা কৃষি জমি-বাস্তু ও জীবন-জীবিকা রক্ষা প্রস্তুতি কমিটি আহূত এই জনসভায় বক্তব্য রাখেন

মঞ্চে উপবিষ্ট কমিটির নেতৃবৃন্দ। বক্তব্য রাখছেন কমরেড সেখ খোদাবক্স

নন্দীগ্রামের উচ্ছেদবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা নন্দ পাত্র। তিনি নন্দীগ্রামের ভূমি উচ্ছেদ বিরোধী ঐতিহাসিক সংগ্রামের কাহিনী তুলে ধরেন এবং সেখানে সর্বস্তরের মানুষ কৃষক-খেতমজুর-বর্গাদার-ভাগচাষি-ছাত্র-যুব-মহিলারা ছোট ছোট সংগ্রাম কমিটি গঠন করে বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে যেভাবে প্রবল রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও শাসকদলের ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে শেষ পর্যন্ত বিজয় অর্জন করেছেন — সে ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি বিশেষভাবে তুলে ধরেন সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনে ঘোমটা দেওয়া-বোরখা পরা মা-বোনেদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কথা। তিনি বলেন, 'আপনাদের এ লড়াই ন্যায়সঙ্গত। আপনারা দলমত নির্বিশেষে কমিটিবদ্ধ হয়ে লড়াই করুন, জয়যুক্ত হবেনই।

সভায় বক্তব্য রাখেন উচ্ছেদ বিরোধী প্রচার অভিযানে নেতৃত্বকারী পাঁচটি জেলার পাঁচজন প্রতিনিধি। তাঁরা প্রায় সকলেই একই সুরে বলেন, প্রচার জাঠার দীর্ঘ পথে হাজার হাজার মানুষ তাঁদের সংবর্ধনা জানিয়েছেন। রাস্তায় অগণিত বাজার কমিটি গাড়ি থামিয়ে মিটিং করিয়েছে এবং অভিযাত্রী দলকে ফুলের তোড়া দিয়ে অভ্যর্থনা করেছে, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও তাঁরাই করেছেন।

পথের ধারের হাজার হাজার দোকানদার এগিয়ে এসেছেন। তাঁরা বলেছেন 'প্রচার জাঠার দাবি তো আমাদেরই দাবি। এ লড়াই তো আমাদেরই লড়াই। আমরা এ লড়াইয়ের সাথে আছি।' 'আমরা জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে নই। জাতীয় সড়ক ৪ লেন করতে সর্বসাকুল্যে ৬৫ থেকে ৭০ ফুট জায়গা লাগে। এর থেকে অনেক বেশি পরিমাণ জমি জাতীয় সড়ক বরাবর বহু পূর্বে অধিগৃহীত হয়ে সরকারের হাতে আছে। তা হলে বাড়তি জমি দখল করা কেন? কেন ২০০ ফুটের অধিক প্রশস্ত করে রাস্তার নামে জমি দখল? অতএব 'বহুপূর্বে অধিগৃহীত জমিতেই রাস্তা নির্মাণ করতে হবে।' — সব মিলিয়ে প্রচার অভিযানের এই বক্তব্য ব্যাপক মানুষের সমর্থন পেয়েছে।

জনসভায় সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি কমরেড সেখ খোদাবক্স বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের নতুন বর্তমান নকসা হল, নানা অজুহাতে কৃষিক্ষেত্র গ্রাস করা এবং জমি দখল করা। ৩৪নং জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ যে মূলত দেশি-বিদেশি বহুজাতিক সংস্থার স্বার্থেই — তা তিনি ব্যাখ্যা করেন। সব শেষে বক্তব্য রাখেন এই আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা ও সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সহসভাপতি কমরেড শঙ্কর ঘোষ। তিনি বলেন, এত বড় উচ্ছেদের আয়োজন অথচ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা কী পাবে, সে নিয়ে আজও পর্যন্ত কোনও সুস্পষ্ট কথা বলছে না সরকার, ক্ষতিপূরণের কোনও প্যাকেজও ঘোষণা করছে না। তিনি বলেন, বিশ্বায়নের নীতি মেনেই যখন এত উচ্ছেদের আয়োজন, তা হলে বিশ্বায়নের নীতি মেনেই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না কেন? কেন সে ক্ষেত্রে দেশীয় বিধি তৈরি করে নামমাত্র ভিক্ষা দেওয়া হবে? আমরা এর বিরোধিতা করছি। বিরোধিতা করছি জাতীয় সড়ক ৪ লেন করার নামে প্রয়োজনাতিরিক্ত জমি অধিগ্রহণের। তিনি বলেন, আমাদের দাবি ও লড়াই সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। তাই এ লড়াইয়ে আমরা জিতবই। চাই লড়াই গড়ে তুলবার উপযোগী সংগঠিত শক্তি - সংগঠন-সংহতি। আমরা সেটা গড়ে তুলবার প্রতিজ্ঞা নিয়েই সুদূর উত্তর দিনাজপুর থেকে উত্তর ২৪ পরগণা পর্যন্ত সংগঠন গড়ে তুলছি। এর ব্যাপকতা বাড়ছে দিন দিন। এই আন্দোলনকে আরও সংগঠিত রূপে গড়ে তুলতে ২৩ ডিসেম্বর বেলা ১টায় কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি হলে গণকনভেনশনে নাগরিকদের অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

কোলাঘাট ঃ দূষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার মানুষ

কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দূষণে সংশ্লিষ্ট এলাকা বিপন্ন। এখানে ৬টি ইউনিটে প্রতিদিন ১২৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা রয়েছে। এজন্য প্রয়োজন প্রায় ১৪ হাজার মেট্রিক টন কয়লা পোড়ানোর। তা পোড়ালে প্রতিদিন ৫ হাজার মেট্রিক টন ছাই অর্থাৎ প্রায় ৬০০ ট্রাক ছাই উৎপন্ন হয়। এই ছাই জমা রাখতে প্রয়োজন ১২০০ একর আয়তনের ছাইপুকুর। কিন্তু রয়েছে মাত্র ২৫৩ একর। অর্থাৎ, কর্তৃপক্ষ মাত্র ২০ শতাংশ ছাই ধরে রাখার ব্যবস্থা করেছে, বাকি ৮০ শতাংশ ছাই ধরে রাখার কোনও ব্যবস্থাই করেনি। ফলে প্রতিদিন প্রায় ৪৮০ ট্রাক ছাই বিভিন্ন নয়ানজুলিতে ফেলা ও রাস্তা নির্মাণের কাজে লাগানোর পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ ছাই যেখানে সেখানে ফেলা হচ্ছে। এতে ঘটছে ব্যাপক পরিবেশ দূষণ। এছাড়া চিমনি দিয়ে নির্গত ছাইয়ে পূর্ব মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলার প্রায় ৫০০ বর্গকিমি এলাকার মানুষের চাষাবাদ ও প্রাণসম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। এলাকায় মানুষের চোখ, ত্বক ও বুকের নানা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সম্প্রতি শান্তিপুরে জনবহুল এলাকায় তিনটি গোডাউনে মানুষের দ্বারা ছাইভর্তি জনিত দূষণ। উপযুক্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা না নিয়ে হাজার হাজার মানুষকে রোগের কবলে ঠেলে দিয়ে কর্তৃপক্ষ এভাবে মুনাফা লুটছে। এই হল পুঁজিবাদী উৎপাদন রীতি যে সুপার প্রফিট ছাড়া কিছু বোঝে না, তার জন্য মানুষের জীবন বিপন্ন হলেও পরোয়া করে না। এই অবস্থায় কৃষক সংগ্রাম পরিষদ দূষণ নিয়ন্ত্রণের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলে। ২১ অক্টোবর কৃষক সংগ্রাম পরিষদ পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদে অভিযোগ জানায়। ১২ নভেম্বর এ বিষয়ে শুনানি হয়। পর্ষদ তাপবিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষকে গাফিলতির জন্য ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা, আগামী ফেব্রুয়ারির মধ্যে ছাই জমে মজে যাওয়া দেনান খাল সংস্কার, ডিসেম্বরের মধ্যেই বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন হ্রাস করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেয়। কৃষক সংগ্রাম পরিষদের সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়েক জানিয়েছেন, শুনানিতে পরিষদের পক্ষে ভূমিকা নিয়েছিলেন পরিষদ সদস্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এ কে ভুইঞা।

পেট্রোলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ

বামদিক থেকে (উপরে) দিল্লি, কলকাতা। (নিচে) পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি হান্ডয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in